দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

হিন্দু সন্ত পরম্পরার উজ্জ্বল নক্ষত্র গুরু নানকদেব
— পৃঃ ১১

জাতিকে সিংহবিক্রমে উদ্বুদ্ধ করেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ
— পৃঃ ৩৭

৭৭ বর্ষ, ১১ সংখ্যা।। ১৮ নভেম্বর, ২০২৪।। ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১।। যুগাব্দ - ৫১২৬।। website : www.eswastika.com

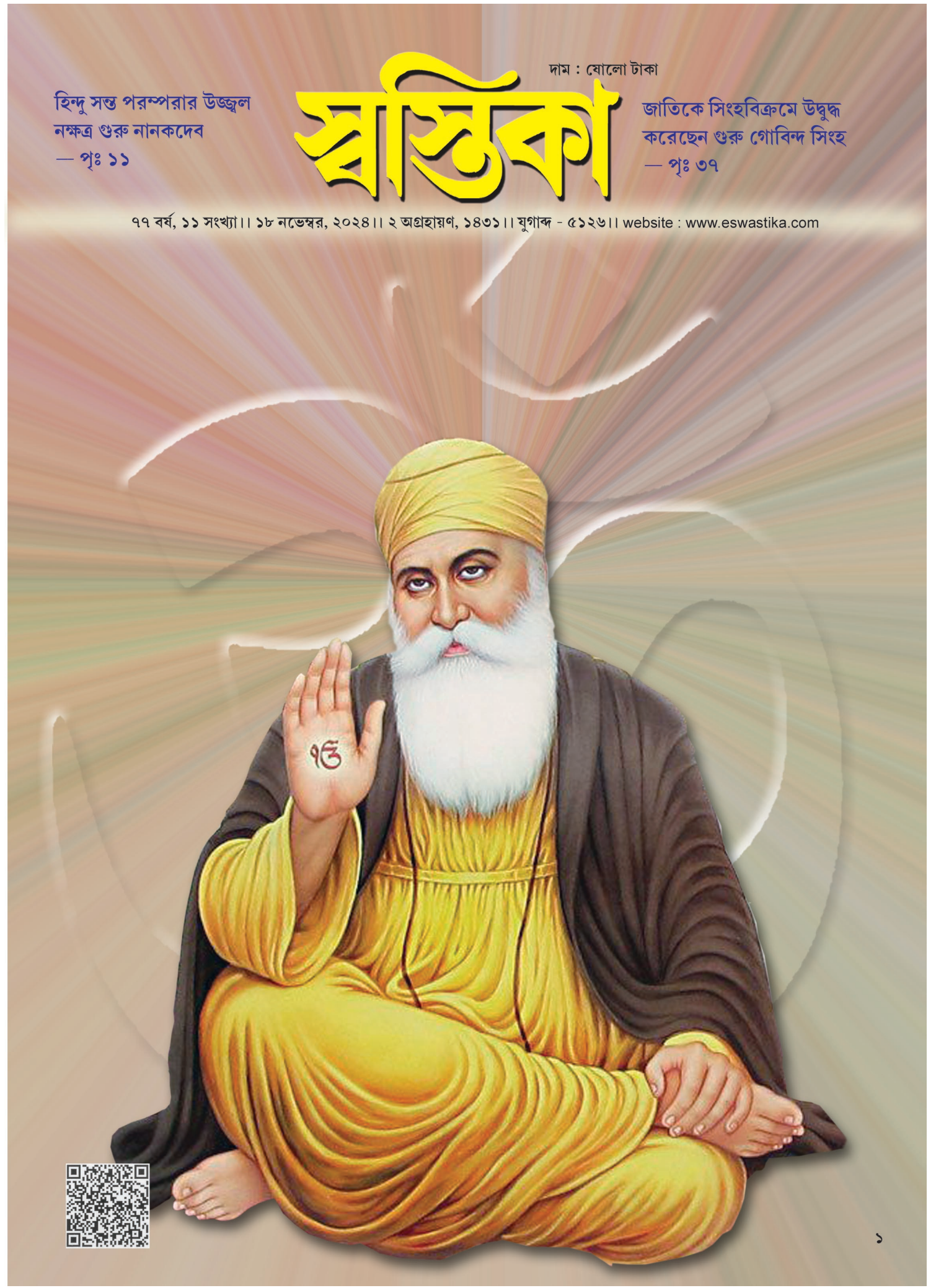

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

১৮ নভেম্বর - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৬,

Website : www.eswastika.com

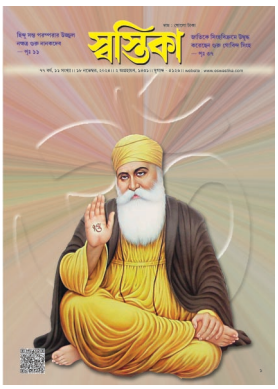

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

সঙ্কটে পড়লেই তৃণমূল খোলনলচে পালটানোর গল্প ছাড়ায় ছাগলের ল্যাজা-মুড়ো ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

যৌন নির্যাতন অতীব 'ছোটো' ঘটনা ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

সাধু-সন্তরা গর্জে উঠেছেন বাংলাদেশে ☐ ৮

ট্রাম্পের জয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে 'অ্যাডভেন্টেজ ভারত'? ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

হিন্দু সন্তপরম্পরার উজ্জ্বল নক্ষত্র গুরু নানকদেব ☐ রবিরঞ্জন সেন ☐ ১১

বাম জামানা থেকেই অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জিঘাংসার বলি হচ্ছেন অভয়ারা ☐ সাধন কুমার পাল ☐ ১৪

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ ☐ আনন্দমোহন দাস ☐ ১৬

গুরু নানকদেব প্রবর্তিত পন্থ হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ ☐ সরোজ চক্রবর্তী ☐ ১৭

বঙ্গের অঙ্গনে গুরু নানকদেব ☐ সোমকান্তি দাস ☐ ২৩

গুরু তেগবাহাদুরের বলিদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ☐ রাজদীপ মিশ্র ☐ ২৪

হিন্দু-শিখ সহাবস্থান : গুরু নানক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ☐ ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ☐ ২৫

ডাকটিকিটে শিখ সম্প্রদায় ☐ সৈকত চট্টোপাধ্যায় ☐ ২৭

রাসলীলা : কখনও শ্যাম কখনও শ্যামা ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

ভগবানের অভিমুখে ভক্তের নিষ্কাম যাত্রাকেই রাসযাত্রা ☐ মিলন খামারিয়া ☐ ৩৪

জাতিকে সিংহবিক্রমে উদ্বুদ্ধ করেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ ☐ শিবাজীপ্রসাদ মণ্ডল ☐ ৩৭

শিখপন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের অনুভব ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ৩৯

ভারতে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ☐ সন্দীপ কুমার সিন্‌হা ☐ ৪৩

ড. মেঘনাদ সাহা এবং 'সবই ব্যাদে আছে' : একটি পর্যালোচনা ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ৪৫

নিয়মিত বিভাগ :

☐ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮-৫০

প্রকাশিত হবে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ২৫ নভেম্বর, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শীতে কীভাবে সুস্থ থাকবেন

শীতের আগমন মনে আলোড়ন তোলে। শীতকাল মানেই দলবেঁধে ঘুরে বেড়ানো, বনভোজন, পিকনিক ইত্যাদি। সামনে ভেসে ওঠে নতুন চাল, নলেন গুড়ের পায়েস, পিঠেপুলি থেকে নানান ফল ও সবজির রকমারি খাবার। নিত্য নতুনভাবে আমরা আমাদের এই প্রিয় ঋতুকে উপভোগ করার চেষ্টা করি। কিন্তু এই প্রিয় ঋতুতেও নানান অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটে। একটু অসাবধান হলেই অসুস্থ হতে পারি আমরা। তাই এই প্রিয় ঋতুতে কীভাবে নিজেকে সুস্থ রেখে শীতের আমেজ উপভোগ করতে পারি সেই বিষয়েই আগামী সংখ্যার স্বস্তিকায় আলোকপাত করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও পুষ্টিবিদ।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

সনাতন ধর্মের যোদ্ধৃ সম্প্রদায়

শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি ভারতবাসীর ঋণ কম নহে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দয়াল নানকের মুখনিঃসৃত কাব্যকৃতি 'বাবরগাথা'র মধ্যে রবাব বাদ্যযন্ত্রের অনুষঙ্গে যে নৃশংসতার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল তাহা ছিল মুঘলসেনার ধ্বংসকার্যের এক অমোচ্য দলিল। চতুষ্পার্শ্বে রুধির এবং ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তাঁহার ব্যথিত হৃদয় অত্যাচারী সেনার বিরুদ্ধে ফুঁসিয়া উঠিল। এহেন রক্ত, এহেন মৃত্যু কীভাবে ভুলিয়া থাকিবেন এক অনুভবী আধ্যাত্মিক পুরুষ! মানুষের সম্পর্ক হইতে তো তিনি বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। দেশবাসীর সঙ্গে তাঁহারও স্থান হইল বাবরের কয়েদখানার অন্ধকার কূপে। ঈশ্বরের নিকট অত্যাচারীর পতন কামনা করিতে হইল; 'মর্দ কা চেলা' রূপে শেরশাহ সুরি আসিয়া বাবরপুত্র হুমায়ুনকে সিংহাসনচ্যুত করিল। গুরু নানক প্রবর্তিত গুরু পরম্পরায় শিখপন্থে রচিত হইয়াছে এক সঙ্ঘবদ্ধ সমাজের অপরূপ চিত্রকল্প। অপরাজেয় এক অন্তরের শক্তিতে 'হিন্দ কী চাদর' গুরু তেগবাহাদুর এবং 'হিন্দ কী হিম্মত' গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুসারী শিখসমাজ সমগ্র ভারতবর্ষকে রক্ষার ভার সেদিন গ্রহণ করিল। এক যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হইল পঞ্জাব। 'বন্দী বীর' কবিতায় সেই ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সেই শিখসমাজ, যাঁহারা পরানের ভয় ভুলিয়া 'গুরুজীর জয়' বলিয়া গর্জিয়া ওঠে। এই সেই শিখসমাজ, যাঁহারা ধর্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণদান করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ওঠে। এই সেই শিখসমাজ, সাঁড়াশি দগ্ধ করিয়া ধর্মান্ধ ঘাতক শরীর ছিন্নভিন্ন করিলেও একটি কাতর শব্দ না করিয়া ধর্মরক্ষার নিমিত্ত স্থির হইয়া প্রাণ বিসর্জন করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কখনোই তুর্কি-পাঠান-মুঘলের অত্যাচারী শাসন মিলনের মহান সুরটিকে ছিন্ন করিতে পারে নাই। মুঘল শাসকের অত্যাচারের প্রতিবাদে গুরু তেগবাহাদুরের প্রাণ বলিদান এক প্রেরণাদায়ী ইতিহাস হইয়া রহিয়াছে। এমন ইতিহাসের সাক্ষী যে সমাজ, তাঁহারাই বর্তমান পঞ্জাবকে ভারতীয় শস্যভাণ্ডার করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহারাই ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে।

এইহেন শিখ সমাজের সংকল্প-সদর্থকতার মধ্যেও পাওয়ার-পলিটিক্সের চোরাস্রোত দয়াল নানকের স্বপ্ন হারাইয়া দিতেছে। দুষ্ট রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে কর্দমাক্ত হইতেছে সুশীল সমাজ। গুরু-পরম্পরার জীবনসাধনা ভুলাইয়া দিতে চাহে ন্যাক্কারজনক রাজনীতি, ভুলাইয়া দিতে চাহে পঞ্চগুরুর আত্মাহুতি, শতসহস্র বীর শিখের আত্মবলিদান। পৃথক খালিস্তানের দাবি উঠিয়াছিল বিভেদের রাজনীতি হইতেই। ভবিষ্যৎ ভারতকে অশান্ত করিবার যে মরিয়া চেষ্টা একদা বৈদেশিক ব্রিটিশ শাসক রাখিয়া গিয়াছিল, তাহাই অদ্য পল্লবীত হইয়াছে পথভ্রষ্ট খালিস্তানপন্থীদের কার্যকলাপে। দেশ বিরোধিতার আগুন তাহাতে ইতিউতি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা তো হইবার কথা নহে! শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবে ভক্তি আন্দোলনের নামদেব, জয়দেব, রবিদাস, সুরদাস, কবীর প্রমুখ সন্তবাণী স্থান পাইয়াছে। তাহাতে বেদ, হরি, রাম, পরব্রহ্ম, যম, ধর্মরাজ, বৈকুণ্ঠ, নির্বাণ, তুরীয় অবস্থা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদের 'তত্ত্বমসি' মন্ত্রকে যেন উচ্চারণ করিয়াছে গুরু গ্রন্থসাহিব।

মনে রাখিতে হইবে, শিখপন্থ সনাতন ধর্মেরই একটি শাখা। যোদ্ধৃ সম্প্রদায়। শিখপন্থ সৃষ্টি হইয়াছিল হিন্দু সমাজের ভেদাভেদ দূর করিয়া সমাজকে পরিশুদ্ধ করিবার প্রয়োজনে। ধর্ম রক্ষা করিবার প্রয়োজনে। গুরু নানকদেব সর্বভূতে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ নির্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন। গুরু নানকের মত ও পথের পুনঃস্মরণ আমাদিগকে করিতেই হইবে, স্বামীজীর লাহোর বক্তৃতার কথা পুনরায় অনুধ্যান করিতেই হইবে। উদ্‌ঘোষ তুলিতে হইবে, 'ওয়াহে গুরুজী কা খালসা, ওয়াহে গুরুজী কী ফতেহ্'।

সুভাষিতম্

উত্তমাঃ আত্মনো খ্যাতাঃ পিতুঃ খ্যাতাশ্চ মধ্যমাঃ।
অধমা মাতুলখ্যাতাঃ শ্বশুরাখ্যাতাশ্চ অধমাধমাঃ।।

আত্ম পরিচয়ে যিনি খ্যাত তিনি উত্তম। পিতৃপরিচয়ে যিনি খ্যাত তিনি মধ্যম। মাতুল পরিচয়ে যিনি খ্যাত তিনি অধম এবং যে শ্বশুর পরিচয়ে খ্যাত সে অধমেরও অধম।

সঙ্কটে পড়লেই তৃণমূল খোলনলচে পালটানোর গল্প ছড়ায়

ছাগলের ল্যাজা-মুড়ো

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

বলি প্রদত্ত ছাগলের ল্যাজা-মুড়ো হয় না। বলা হয় 'ছাগলের আগায় বা গোড়ায় কাটি তাতে কার কী?' নৈরাজ্যের স্যাঙ্গাত সঙ্গী তৃণমূলে ২০২৫-এ খোলনলচে পালটানোর গল্প ছড়াচ্ছে। শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের মধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের হাল ধরবেন আর মমতার রাজনৈতিক ছুটি হয়ে যাবে। জানুয়ারিতে তৃণমূলের ২৭তম জন্মদিনে মমতা অবসর ঘোষণাও করতে পারেন। আকাশ ভাঙবে তবে এটা অসম্ভব। তাহলে কেন বিদায় ঘণ্টি? সব উপদেষ্টা সংস্থার খেলা। তৃণমূলের দুষ্কর্ম ঢাকতে কিছু দালাল শ্রেণীর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সংবাদপত্র আর টিভি চ্যানেল তাতে মেতেছে।

২০০০-এ জ্যোতি বসুকে মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে তাড়িয়েছিল সিপিএম। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। দু'দফায় খতম হয়ে যায়। ২০০১-এর ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি (১৪৩ আসন)। চৌত্রিশ বছর বাম জোটের সবচেয়ে কম আসন নিয়ে সরকার গড়েছিল। এগারো বছরেই বসুর বদলি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রাজনৈতিক প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়। পপাত ধরণীতল থেকে আর ওঠেনি বাম। ২০০৮ সালের পর থেকে তাদের ভোট ক্রমান্বয়ে কমেছে দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া। তৃণমূল ছড়াচ্ছে মমতার হাত ধরে এমনটা তৃণমূলিদের মনে হতে পারে। আমার ধারণা ২০২৬-এর ভোটে আগে জল মাপতে এটা মমতার স্ক্রিপ্ট। খোলনলচের গল্প আর 'মক্কা' যাওয়া এক নাটক। ম্যাজিক রিয়ালিজমে নির্ভর করে ইসলামিক ইতিহাসের ছাত্র সলমন রুশদি দি স্যাটানিক ভার্সেস লিখে ইসলামি দুনিয়ার বিরাগভাজন হন। না পড়ে বোঝার মুসলমান সংখ্যা বেশি তাই তাঁকে খেসারত দিতে হয়।

হিন্দু ছাড়া অন্যান্য মতাবলম্বীদের মধ্যে কট্টরপন্থীরা সংখ্যায় বেশি। তা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য সবার থাকে না। ভারত তার ব্যতিক্রম। মমতার কাছে রাজনৈতিক কট্টরবাদ আর ক্ষমতা দখল সমান গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক আন্দোলন, প্রতিবাদ, মানুষের দাবি মমতার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কট্টরবাদীদের মতো। তাই রাস্তার গুন্ডা পাঠিয়ে কন্যা অভয়ার স্মৃতিতে নির্মিত মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হয়। প্রতীক মূর্তি ক্ষতবিক্ষত করে সরিয়ে ফেলা হয়। এটাই মমতার কট্টরবাদী গণতন্ত্র। পরমত অসহিষ্ণুতার জনক কংগ্রেস পরিবারেই মমতার রাজনৈতিক জন্ম। আমার পাঁঠা আগায় বা গোড়ায় যখন ইচ্ছা কাটি বলে ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় জরুরি অবস্থা এবং ৪৯ বার বিভিন্ন রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেছিলেন। মমতার হাতে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থাকলে ঠিক সেটার পুনরাবৃত্তি করতেন। তৃণমূল এ রাজ্যের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ দল নয়। তবু তারা মানুষের ভোটে জেতে। সেই মানুষ কারা? এর মধ্যে যেমন রয়েছে ভারত বিরোধী জেহাদি, বামপন্থী তেমনই রয়েছেন বহু লোক যারা স্থির করেছেন তাদের কোনো মত নেই। অনেকটা মমতার পুরোনো অর্থমন্ত্রীর মতো। মমতার মত তাদের মত। তাতে দেনা-পাওনার সুবিধা হয়।

আমি অনেকবার বলেছি ভোটপ্রাপ্তির অঙ্কে এ রাজ্যে তৃণমূল আর বিজেপি সমান সমান। তফাত শুধু ভোটদাতাদের শিরদাঁড়ায়। কে, কতটা কীভাবে বাঁকাতে পারে বা রুখতে পারে সেই সেই হিসাব তারা কষে। আর এইভাবেই রাজ্যের ৪৬ শতাংশ মানুষ মমতার দিকে সরেছে। তাদের ফিরিয়ে আনা বিরোধী দল বিজেপির দায়িত্ব। অন্য সব বিরোধীরা মমতার লেজুড়। অবস্থার বিচারে। কেরালার ভোটে প্রিয়াঙ্কা বঢ্রা দেশ বিরোধী জামাত-ই- ইসলামির সাহায্য নিচ্ছে। সিপিএম-এর কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এই দাবি তোলার পরেও বঙ্গ সিপিএম নপুংসকের ভূমিকা নিয়েছে। আমার ধারণা এ রাজ্যে দু'জন শুভেন্দু অধিকারী থাকলেই মমতা ধসে যেত।

২০১১ সালে সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে মমতা একা জেতেনি। জিতেছিল ৪-৫টি মমতা। মুকুল মমতা (রাজ্য পুলিশে ফাটল), তৎকালীন শুভেন্দু মমতা (মেদিনীপুর-সহ ৯টি জেলার দায়িত্বে), অনুব্রত মমতা (এখন জেল ফেরত), পার্থ আর জ্যোতিপ্রিয় মমতা (দু'জনেই জেলে) আর ফিরহাদ মমতা। অভিষেক কিন্তু কোনো মমতা নয়। তাই ৩৮ বছরের অভিষেকের ৬৮ বছরের মমতাকে ঝেড়ে ফেলতে প্রাণ কাঁদবে না। যদিও 'লয়াল দ্যান দ্য কিং' ভাবটা রাখবেন। কিন্তু তাতে মানুষের কী লাভ? ছাগলের ল্যাজা আর মুড়ো দু'ই সমান। না পালটালে মানুষ থাকবে পুরনো তিমিরেই। তাই সব বিচারের আশায় হয়তো প্রয়োজন দু'জন, তিনজন বা চারজন শুভেন্দুর। সংখ্যা যত বেশি তাই ছাগলের ল্যাজামুড়ো কাটার সম্ভাবনা ততটাই বেশি। সেটাই মমতা আটকাতে চান।

ছাগলের ল্যাজা আর মুড়ো দু'ই সমান। না পালটালে মানুষ থাকবে পুরনো তিমিরেই। তাই সব বিচারের আশায় হয়তো প্রয়োজন দু'জন, তিনজন বা চারজন শুভেন্দুর। সংখ্যা যত বেশি তাই ছাগলের ল্যাজামুড়ো কাটার সম্ভাবনা ততটাই বেশি।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

যৌন নির্যাতন অতীব 'ছোটো' ঘটনা

মদতদাত্রীষু দিদি,

আপনি বলবেন, সংবাদমাধ্যম আপনার শত্রু। বন্ধু সংবাদমাধ্যমগুলো অবশ্য এসব দেখাচ্ছে না। দেখালেও খণ। বলছে দুষ্কৃতী তাণ্ডব। তবে দিদি, এটা মানুষ যে। সমাজের দর্পণ হলো সংবাদমাধ্যম। তবে সেই উপলব্ধি আজকাল আতঙ্কজনক। প্রায় প্রতিদিন খবরের কাগজ, টেলিভিশন এবং সমাজমাধ্যমের পাঠক-দর্শকদের সামনে আসছে রাজ্যের নানা অঞ্চলে মেয়েদের উপর যৌন নির্যাতনের ধারাবিবরণী। অনেক সময়েই যে নির্যাতন ধর্ষণের চেহারা নিচ্ছে। আরও বিপদের যে, কোথাও কোথাও গণধর্ষণের। আট থেকে আশি, শিশু, কিশোরী, প্রবীণা কেউই বাদ যাচ্ছেন না।

আরজি কর হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের ভয়াবহ ধর্ষণ ও খুনের পরে প্রায় তিন মাস হয়ে গিয়েছে। সেই অঘটনকে কেন্দ্র করে অভূতপূর্ব প্রতিবাদ আন্দোলন এখনও চলছে। দিন রাত উচ্চারিত হয়ে চলেছে যে, এমন ঘটনা আর ঘটতে দেওয়া চলবে না। কিন্তু সেই অঙ্গীকারে যেন শাসক মানে আপনি মানে আপনার দল নেই। মনে হচ্ছে, এই রাজ্যের শাসক বাদে বাকি সবাই ধর্ষণের বিপক্ষে। কারণ, সেই অঘটনের পরে একের পর এক ঘটে চলেছে মেয়েদের শরীর ও মনকে ক্ষতবিক্ষত করার হিংস্রতা। বেশিরভাগ সময়েই আক্রান্ত কন্যার পরিচিত, কখনও প্রতিবেশী, কখনও বা 'প্রেমিক'। উর্ধ্বকার মধ্যে লিখলাম কারণ তারা প্রেমিক কিনা তা নিয়েই আমার মনে প্রশ্ন রয়েছে।

দিদি, কথায় কথায় অন্য রাজ্যের উদাহরণ না টেনে যদি পশ্চিমবঙ্গের দিকে নজর দেওয়া যায় তবে এই রাজ্যের মঙ্গল হবে। পরিস্থিতি স্পষ্টতই বঙ্গের সমাজের এক গভীর অসুস্থতার পরিচয় দেয়। এর মূলে আর্থিক সঙ্কট, রাজনৈতিক হিংসা এবং শিক্ষা- সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আছে বলেই আমি মনে করি। জটিল ব্যাধির নিরাময়ের জন্য সমাজের দীর্ঘমেয়াদি এবং সার্বিক সংস্কার অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তার অপেক্ষায় বসে থাকাটা দিদি কোনও কাজের কথা নয়। বাস্তববুদ্ধি দাবি করে যে, মেয়েদের উপর আক্রমণের প্রবণতাকে দমন করতে প্রশাসন তার সর্বস্তরে, বিশেষত স্থানীয় স্তরে, তৎপর হবে। কিন্তু হচ্ছে কি? হলেও রুখতে পারছে কি? পারছে না। আসলে সদিচ্ছার অভাব।

লোকদেখানো তৎপরতা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজন একশো শতাংশ মনের থেকে তৎপরতা। অপরাধীদের শনাক্ত করা এবং অপরাধ প্রমাণের জন্য দরকারি কাজগুলি যুদ্ধকালীন উদ্যমে করাই তার প্রধান ও একমাত্র শর্ত। দিদি, আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধকালীন তৎপরতা চাই। কারণ, নারী-নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রশাসনের যুদ্ধ ঘোষণাই এখন জরুরি। দল, রং না দেখে তৎপরতা চাই। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা ধর্ষণ বা অন্য নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত, তারা সচরাচর স্থানীয় অধিবাসী বলেই তাদের চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করা তুলনায় সহজ হওয়ার কথা। প্রয়োজন উদ্যমের, প্রয়োজন সদিচ্ছার। তিনি তৃণমূলের ঘনিষ্ঠ কি না সেটা দেখা উচিত নয়। আর কোনও ঘটনাকেই 'ছোটো' বা 'বিচ্ছিন্ন' বলে দেগে দেওয়া উচিত নয় মোটেও।

বঙ্গে এটাই সমস্যা। আপনার চোখে 'ছোটোখাটো' ঘটনাগুলোই এখন বেড়ে উঠেছে। পুলিস প্রশাসনের আচরণ নারী-নির্যাতনের ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের শাস্ত দেওয়ার সদিচ্ছা এবং তৎপরতা সেভাবে দেখাই যায় না। অপরাধীরা অনেক সময়েই স্থানীয় স্তরে নানা ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে। মানে আপনার কোনও তুতো ভাই হয়ে ওঠে। স্থানীয় পুলিশ এবং প্রশাসন সেই প্রভাব বা ক্ষমতার দ্বারা বহুলাংশে চালিত হয়। ঘাড়ে কটা মাথা তাদের? সামাজিক ক্ষোভ বা আদালতের নির্দেশ কখনও-কখনও পুলিশকে কাজে নামতে বাধ্য করে। সেটা না হলে সবাই চুপ।

যাঁরা প্রশাসনের নিয়ামক মানে সরকারে রয়েছেন, সেই রাজনীতিকরা যদি নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থকে আইন এবং নৈতিকতার উপরে স্থান দিয়ে চলেন এবং দুর্বৃত্তদের প্রশ্রয় দেওয়ার রীতিই চালিয়ে যান, তা হলে ধর্ষণের মতো অপরাধও প্রশ্রয় পাবেই। এই প্রতিকারহীন অপরাধের ধারাটি এত প্রবল বলেই সমাজের একটি বড়ো অংশের মধ্যে নিজের হাতে আইন তুলে নেওয়ার প্রবণতাও দ্রুত বেড়ে চলেছে। সাম্প্রতিক নানা ঘটনায় দেখা গিয়েছে, ধর্ষণে অভিযুক্তদের পিটিয়ে মারার জন্য নাগরিকরা পুলিশের কাছে তীব্রস্বরে দাবি জানিয়েছেন। এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে মন্ত্রী বা উচ্চপদাধিকারী দলনেতা অবধি রাজনীতিকরা অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাৎক্ষণিক 'বিচার'-এর নামে প্রতিহিংসাকেই উচিত শাস্তি হিসেবে মর্যাদা দিচ্ছেন। অনেক সময়েই সেই শাস্তি বা বিচার পক্ষপাতপূর্ণ। দিদি, আমি বলি বরং, আপনি নিজেই এবার সক্রিয় হোন। ফেসবুকে লাইভ করে সবাইকে জানাতে হবে না। বরং, একান্ত আন্তরিকভাবে সিদ্ধান্ত নিন। সময় খুবই কম। অন্ধকার নামছে দিদি। □

সাধু-সন্তরা গর্জে উঠেছেন বাংলাদেশে

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ 'হিন্দুদের বাংলাদেশ থেকে উৎখাতের চেষ্টা হলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।' যে মঞ্চ থেকে স্বাধীনতার ৬ দফা দাবি উঠেছিল, সেই মাঠে বাংলাদেশে সব মঠ মিশনের সাধুরা সমবেত হয়েছেন হিন্দুদের দাবি আদায়ে। 'হিন্দুদের ওপর যতই নিপীড়ন হবে, আমরা তত বেশি ঐক্যবদ্ধ হব। দাবি আদায়ে বিভাগ ও জেলায় সমাবেশ শেষে আমরা ঢাকা অভিমুখে লংমার্চ করব।'

গত ২৫ অক্টোবর চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদীঘি ময়দানে বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ আয়োজিত সমাবেশ থেকে বাংলাদেশের সাধুসন্তরা আট দফা দাবিতে এভাবেই গর্জে ওঠেন। এই জনসমুদ্র থেকে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমাবেশ শেষে ঢাকা অভিমুখে লংমার্চের ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৬ সালে এই লালদীঘি ময়দানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালির স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার লড়াইয়ে এই ময়দানেই ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন। আর এই ৬ দফার পথ ধরেই একাত্তরে এক রক্তাক্ত লড়াইয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আসে।

'আমার মাটি আমার মা, এদেশ ছেড়ে কোথাও যাব না'-সহ নানা স্লোগান দিয়ে হাজার হাজার নারী-পুরুষ মিছিল করে দল বেঁধে এই সমাবেশে যোগ দেন। বেলা আড়াইটার পর থেকে চট্টগ্রাম নগর এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে লোকজন সমাবেশে আসতে শুরু করেন। সাম্প্রতিক সময়ে কোনো রাজনৈতিক দলের সমাবেশেও এতো মানুষের সমাগম হয়নি।

সমাবেশের প্রধান বক্তা বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও চট্টগ্রাম পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, কেউ যদি আমাদের উৎখাত করে শান্তিতে থাকার চেষ্টা করেন, তাহলে এ ভূমি আফগানিস্তান হবে, সিরিয়া হবে। সাম্প্রদায়িক আচরণ করে বাংলাদেশের কোনো গণতান্ত্রিক শক্তি রাজনীতি করার সুযোগ পাবে না। ক্ষমতার পটপরিবর্তন হচ্ছে বারবার, এ দেশে স্থিতিশীলতা আসছে না। কারণ সহনশীলতা লুপ্ত হচ্ছে। সম্মানবোধ হারিয়ে যাচ্ছে, সংখ্যালঘু শিক্ষকদের পদত্যাগ করানো হচ্ছে। শুধু সংখ্যালঘু পরিচয়ে ৯৩ জনকে পুলিশের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ভেটেরিনারি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। মাঝখানে কিছুদিন এমন অপকর্ম থেমে গিয়েছিল। এখন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। আমরা আর নীরব থাকব না।

তিনি বলেন, কেউ যদি রাজনৈতিক দুর্বৃত্তপনায় জড়িত থাকে, তাদের আসামি করুন, বিরোধিতা করব না। কিন্তু বেছে বেছে হিন্দুদের আসামি করা হচ্ছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল চারটি মূল নীতিতে। আমাদের দলীয় পরিচয়ে মনোনয়ন দেওয়া হয়। এখন হিন্দুদের অস্তিত্বের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা গণতন্ত্রের নামে প্রহসনকে মেনে নেব না। আমরা সংখ্যানুপাতিক হারে সংসদে আসন চাই।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বলেন, বাংলাদেশে সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে— আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয়-তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে সংবিধান সংশোধন মানব না। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি হিন্দু হয়েছেন। আর এদেশে একজন হিন্দু প্রধান বিচারপতিকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়েছে। জেএম সেন হলে দুর্গা পূজায় ইসলামি দল এসে ইসলামি দাওয়াতের গান গেয়ে গেল, তাদের বিরুদ্ধে মামলা হলেও আসামিদের জামিন হয়ে গেল। আমাদের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত হানলেও জামিন পায়। আর ইসলামের অনুভূতিতে আঘাত লাগার অভিযোগ এনে হিন্দুদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হচ্ছে।

পটিয়া পাঁচরিয়া তপোবন আশ্রমের অধ্যক্ষ রবীশ্বরানন্দ পুরী মহারাজ বলেন, এই দেশ আমার, এই মাটি আমার। এখানকার স্বাধিকারের জন্য বিপ্লবী সূর্য সেনরা জীবন দিয়েছেন। দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকব। এই আন্দোলন আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার রক্ষার আন্দোলন। আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন মঠ-মন্দিরের মহারাজ, পুরোহিতদের সমন্বয়ে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

সমাবেশে কৈবল্যধাম রামঠাকুর আশ্রমের মহারাজ কালিপদ ভট্টাচার্য বলেন, সনাতনী সমাবেশ যাতে উজ্জীবিত হয়, এ জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। সনাতনী সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন ৮ দফা দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। গোপীনাথ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, যে নতুন বাংলাদেশ গঠন করা হলো সেখানে প্রশাসনের ব্যবস্থা থাকার পরও কেন ষষ্ঠী পূজার দিন প্রতিমা ভাঙা হলো? বিসর্জনের শোভাযাত্রায় কেন ঢিল ছোড়া হলো। এসবের জবাব দিতে হবে।

গৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারীর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন শঙ্কর মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তপনানন্দ গিরি মহারাজ, ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের অধ্যক্ষ লীলারাজ গৌর দাস ব্রহ্মচারী, বাঁশখালি ঋষিধামের মোহন্ত সচ্চিদানন্দ পুরী মহারাজ প্রমুখ।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী পরে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই এটা সাধুসন্তদের আন্দোলন। এটি সরকার বা কোনো দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। সংবিধান, আইনকানুন-সহ সব কিছুতে সাম্য ও অসাম্প্রদায়িকতা চাই আমরা যাতে সবাই সমান মর্যাদা পেতে পারি। তবে এখন 'সরকারকে চাপে ফেলতে কিংবা আওয়ামি লিগকে সুযোগ করে দিতে মাঠে নেমেছেন' বলে সরকার সমর্থকরা সামাজিক মাধ্যমে যে প্রচারণা চালাচ্ছে তা প্রত্যাখ্যান করেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। তিনি বলেন, হিন্দুরা কথা বললে তাতে রাজনৈতিক ট্যাগ দেওয়া কিংবা অন্য দেশকে টেনে আনা সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনাগুলো উপেক্ষার পুরনো কৌশল। দেশকে এগিয়ে নিতে হলে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে এগুতে হবে এটাই আমরা বলতে চাইছি।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৩ সাল থেকে পরবর্তী নয় বছরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের উপর সাড়ে তিন হাজারের বেশি হামলার ঘটনা ঘটেছে।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, একটি ঘটনাতেও কোনো ব্যক্তিকে বিচার শেষ করে শাস্তি দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত করলে জামিন পায়। অন্যদিকে অন্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথা বলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। আমরা কিছু বললে আমাদের একটি দলের ট্যাগ দেওয়া হয়। অন্য দেশের ট্যাগ দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, আমরা এখন রাস্তায় নেমেছি কারণ এখন পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। তবে কিছু ঘটনা আমাদের বিচলিত করেছে। আগে বাড়িঘর মন্দির বা ব্যক্তির ওপর হামলা হয়েছে নিয়মিত। এখন জীবিকায় হাত দেওয়া হচ্ছে। শুধু হিন্দু বলেই চাকরিচ্যুত ও পদাবনতির ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এসব কারণে আমাদের প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। সরকার সংস্কারের লক্ষ্যে দশটি কমিশন করেছে কিন্তু এসব কমিশনে তো সংখ্যালঘু বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নেই। আমরা চাই আমরা যেন আমাদের কথা তুলতে পারি।

হিন্দু নেতাদের দাবি, ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামাত বিজয়ী হওয়ার পর সারাদেশে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হামলা হয়। ২০০৮ সালে নির্বাচনে আওয়ামি লিগ ক্ষমতায় আসার পর সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে সেই সহিংসতার জন্য কমিশন হলেও আওয়ামি লিগ সরকার পনেরো বছরে কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন ছিলেন সেই কমিশনের প্রধান। সে সময় চট্টগ্রামে অধ্যক্ষ গোপালকৃষ্ণ মুহুরী হত্যাকাণ্ড দেশজুড়ে আলোচনা তৈরি করলেও এখন পর্যন্ত সেই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার হয়নি। ২০০৬ সালে রাউজানে জ্ঞানজ্যোতি হত্যাকাণ্ড ও ২০১২ সালে রামুর বৌদ্ধ মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন তুললেও বিচার হয়নি কারও। ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর রাতে রামুর ১২টি বৌদ্ধ বিহার, উপাসনালয়ে অগ্নিসংযোগ ও হামলা চালায় দুর্বৃত্তরা। একইসঙ্গে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ৩০টি বাড়িতে হামলা, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় সোচ্চার হয়েছিল বিশ্বের অন্যান্য দেশে বসবাসকারী হিন্দুরাও।

ফেসবুকে ধর্মীয় অবমাননাকর ছবি পোস্টের অভিযোগ তুলে ২০১৬ সালের ৩০ অক্টোবর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে পনেরোটি মন্দির ও হিন্দুদের তিন শতাধিক বাড়িঘরে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় দেশজুড়ে তোলপাড় হলেও এর আট মামলার সাতটিরই বিচার কাজ শেষ হয়নি। ২০২১ সালে দুর্গাপূজার সময় কুমিল্লার একটা পূজামণ্ডপে দেবীর পায়ের নীচে কোরান পাওয়ার অভিযোগ ঘিরে দেশজুড়ে মন্দির মণ্ডপে হামলার ঘটনা ঘটেছিল। পরে পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছিল, এক জেহাদি মুসলমান হিন্দুদের ফাঁসাতে এই কাজটি করেছিল। চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, ২০২১ সালের ঘটনায় দেশজুড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি আমরা। ১৫৪টি দেশে ওই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে।

সামাজিক মাধ্যমে অনেকে অপপ্রচার করছেন যে সনাতন ধর্মের মানুষ আওয়ামি লিগকে সুবিধা দেওয়ার জন্য এখন রাস্তায় নেমেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, এটি আক্রমণকারী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পুরনো খেলা। এ কারণেই আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি। কারণ দেশকে সঠিক পথে নিতে হলে সবার সঙ্গেই সমান আচরণ করতে হবে এবং সবাইকে সমান সম্মান ও নিরাপত্তাবোধ নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক রং দিয়ে উপেক্ষা করার প্রবণতার কৌশল পুরনো। আমরা কিছু বললে ভারতের প্রসঙ্গ টানা হয়। আমরাও বলতে চাই যে পাকিস্তানেও তো সংখ্যালঘু কমিশন ও মন্ত্রণালয় আছে। তাহলে বাংলাদেশে কেন থাকবে না?

মনে রাখতে হবে যে বিশ্বের কোথাও একজন মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেমন সারাবিশ্বের মুসলমানদের মন কাঁদে, তেমনি একজন হিন্দুর ক্ষতি হলে সারা বিশ্বের হিন্দুদের মন কাঁদবে।

আন্দোলনের আট দফা দাবি হলো, সংখ্যালঘু বিষয়ক গঠন, হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকে হিন্দু ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টকেও ফাউন্ডেশনে উন্নীতকরণ, দেবোত্তর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন এবং অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন বাস্তবায়ন, সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপাসনালয় নির্মাণ ও হোস্টেলে প্রার্থনা কক্ষ স্থাপন, সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড আধুনিকীকরণ এবং দুর্গাপূজার পাঁচ দিন ছুটি প্রদান।

উল্লেখ্য, চট্টগ্রামের বিশাল সমাবেশ থেকে এই আটদফা উত্থাপন করায় চিন্ময় প্রভু-সহ ১৯ জন সংগঠকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়েছে। □

চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বলেন, একটি ঘটনাতেও কোনো ব্যক্তিকে বিচার শেষ করে শাস্তি দেওয়া হয়নি। বরং আমাদের ধর্মের অনুভূতিতে আঘাত করলে জামিন পায়। অন্যদিকে অন্য ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথা বলে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হয়। আমরা কিছু বললে আমাদের একটি দলের ট্যাগ দেওয়া হয়। অন্য দেশের ট্যাগ দেওয়া হয়।

ট্রাম্পের জয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ‘অ্যাডভান্টেজ ভারত’?

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন। ট্রাম্পের জয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতি কোন দিকে মোড় নিতে পারে? ভারতের জন্যই-বা এই জয় কূটনীতিতে কোন ইতিবাচক খরব বয়ে আনছে? ভবিষ্যত এর উত্তর দিলেও কিছু অনুমান এখনই করে ফেলা দুঃসাধ্য নয়। এই মুহূর্তে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে ভারতের অন্যতম মাথাব্যথার কারণ কানাডা।

জানা যাচ্ছে, খালিস্তানিদের প্রতি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডোর নরম মনোভাবে ট্রাম্প আদৌ খুশি নন এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর তিনি তার বিরুদ্ধে বড়ো পদক্ষেপ নিতে পারেন বলেও ধারণা করা হচ্ছে। ট্রাম্পের জয়ের কারণে ট্রুডো ট্যারিফ ট্যাক্স নিয়ে ভয় পাচ্ছেন। কানাডা তার রপ্তানির ক্ষেত্রে ৭৫ শতাংশ আমেরিকার উপর নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতিতে শুল্ক বৃদ্ধি নিয়ে বিভ্রান্তিতে রয়েছে কানাডা সরকার। ট্রাম্প যখন প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট হন, তখন তিনি উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির পুনর্গঠনের পদক্ষেপ নেন। এছাড়াও, অটোসেক্টরে ২৫ শতাংশ শুল্ক বিবেচনা করা হয়েছিল। ট্রাম্পের এই ধরনের পদক্ষেপ কানাডার জন্য হুমকি-স্বরূপ।

ভারতের দ্বিতীয় মাথাব্যথার কারণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিরাপত্তা। বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান মহম্মদ ইউনুস ট্রাম্পের জয়ে প্রবল অস্বস্তিতে ও চাপে রয়েছেন। এর কারণ হলো, বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের পর আগস্ট মাসে ইউনুসের হাতে ক্ষমতার লাগাম তুলে দেওয়া হয়েছিল। তাকে সাধারণত বাইডেন-প্রশাসনের কাছের মানুষ বলে মনে করা হয়। বাইডেন সরকারের সবুজ সংকেতের পরই তাকে বাংলাদেশের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখন ট্রাম্প আগামী বছর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর আমেরিকা ও বাংলাদেশের সম্পর্কের বড়ো ইউ-টার্ন আসতে পারে বলে কূটনীতিকরা মনে করছেন।

মহম্মদ ইউনুসের অস্বস্তির আরও একটা বড়ো কারণ, ট্রাম্পের সঙ্গে সম্পর্কের মধ্যে প্রতিবন্ধক তার বামপন্থী মতাদর্শ। ট্রাম্পের ক্ষমতা দখলের পর বাংলাদেশ ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক খুব একটা ভালো হবে বলে আশা করা যাচ্ছে না। মহম্মদ ইউনুসের সরকারও জো বাইডেন সরকারের কাছ থেকে এখন পর্যন্ত যে সমর্থন পেয়েছে তাও আর পাবে না। কারণ ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত যখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন মহম্মদ ইউনুসের সঙ্গে তার সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না। ২০১৬ সালে ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল হোয়াইট হাউসে তার সঙ্গে দেখা করে। ওই প্রতিনিধিদলকে মহম্মদ ইউনুস সম্পর্কে প্রশ্ন করে ট্রাম্প বলেন, ‘ঢাকার ওই মাইক্রো ফাইন্যান্সার কোথায়?’ ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, ‘আমি শুনেছি যে তিনি আমাকে নির্বাচনে হারাতে চান। এ জন্য তিনি অনুদানও দিয়েছেন।’ ইউনুস ক্লিনটন ফাউন্ডেশনের আর্থিক উপদেষ্টা ছিলেন এবং ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ছিলেন ট্রাম্পের মুখ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তার ফলে এই সম্পর্কের প্রভাব আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে পড়বে। ট্রাম্পে ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখছে চীনও। বেজিংকে এবার আরও চাপে ফেলার সম্ভাবনা ওয়াশিংটনের। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হলেও মুদ্রাসঙ্কোচন সেখানকার এক বড়ো সমস্যা। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের জেতার অব্যবহিত পরেই ৮ নভেম্বর চীন ১.৪ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের এক নতুন আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, তার গতি হারাতে থাকা ঘরোয়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে উৎসাহিত করতে।

২০১৮ সালে চীনা পণ্য আমদানিতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। ‘বদলা’ নিতে চীন মার্কিন পণ্যের আমদানিতে ২৫০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক আরোপ করে আমেরিকা। ‘বদলা’ নিতে চীন মার্কিন পণ্যের আমদানিতে চাপিয়ে দেয় ১১০ বিলিয়ন ডলার শুল্ক। ট্রাম্প ফিরলে ৬০ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিলই। ৭ নভেম্বর মার্কিন মসনদে বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতার প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হতেই আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে মরিয়া চীন। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে বসেই ‘অ্যাকশন মুডে’ ডোনাল্ড ট্রাম্প। এশিয়ায় বাড়তে থাকা চীনা আগ্রাসন রুখতে পরিকল্পনা শুরু করে দিলেন তিনি। আন্তর্জাতিক মহলে এই জল্পনা চরম আকার নিয়েছে কারণ, রিপাবলিকান পার্টির সদস্য মাইক ওয়াল্টজকে আমেরিকার নিরাপত্তা পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব দিয়েছেন ট্রাম্প, যিনি চীনের কট্টর সমালোচক হিসেবেই পরিচিত। ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশ্বস্ত ওয়াল্টজ দীর্ঘ বছর আমেরিকার ন্যাশনাল গার্ডের কর্নেলের দায়িত্ব সামলেছেন এবং এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের গতিবিধির তীব্র বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। শুধু তাই নয়, এই অঞ্চলে সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকারও পরামর্শ দিয়েছিলেন। ওয়াল্টজ রিপাবলিকানে চীন টাস্ক ফোর্সের দায়িত্বে ছিলেন। সেখানে থাকাকালিন তিনি জানিয়েছিলেন যদি ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোনও যুদ্ধ হয়, তবে তার জন্য মার্কিন সেনা অতটাও প্রস্তুত নয়, যতখানি হওয়া প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, চলতি বছরে তাঁর বই ‘হার্ড ট্রুথ’-এ চীনের সঙ্গে আমেরিকার সম্ভাব্য যুদ্ধ এড়াতে পাঁচ রণনীতি বাতলে দিয়েছিলেন ওয়াল্টজ। যেখানে উল্লেখযোগ্য ছিল, তাইওয়ানকে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রের জোগান, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের সঙ্গে বিবাদ রয়েছে এমন সব দেশের পাশে দাঁড়ানো এবং মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমানের আধুনিকীকরণ। চীনের কট্টর সমালোচক ওয়াল্টজকে মার্কিন নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্বে আনা আসলে ট্রাম্পের তরফে চীনকে বার্তা হিসাবেই দেখছে কূটনৈতিক মহল। □

হিন্দু সন্ত পরম্পরার উজ্জ্বল নক্ষত্র গুরু নানকদেব

গুরু নানক ও তাঁর পরম্পরার জন্যই পঞ্জাব এবং বৃহত্তর উত্তর ভারত রক্ষিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি বৃদ্ধি ও পুষ্ট হয়েছিল।

রবি রঞ্জন সেন

মধ্যযুগে যখন ভারতবর্ষ বিদেশি-বিধর্মী শক্তিদ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার ধর্ম, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জীবন-মরণ সংগ্রামে আবদ্ধ ছিল, তখন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বহু সাধক-মনীষীর আবির্ভাব হয় যাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজ সরল ভাষার ভক্তিধর্ম প্রচারদ্বারা ভারতীয় ধর্মপরম্পরাকে সজীব রেখেছিলেন। মধ্যযুগের এই সন্ত পরম্পরায় উল্লেখযোগ্য ছিলেন মহারাষ্ট্রে জ্ঞানদেব, একনাথ, তুকারাম প্রমুখ বঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ; উত্তরভারতে কবীরদাস, দাদু দয়াল, মীরাবাঈ এবং পঞ্জাবে গুরু নানক ও তাঁর উত্তরসূরিরা যাঁরা পরবর্তীকালে শিখ গুরু নামে আখ্যায়িত হলেন।

এই ভক্তি প্রচারকগণ বেদ-উপনিষদের সংস্কৃত বাণীকে সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা জাতি-বর্ণের প্রাচীর ভেঙে হিন্দু সমাজকে নামজপের মাধ্যমে একত্রিত করেছেন। কঠিন আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে সহজ নামজপ ও নামগানের দ্বারা প্রান্তিক, দরিদ্র, নিম্নবর্গীয় শ্রেণীকে সহজে পালনীয় পথের সন্ধান প্রদান করেছিলেন। এইভাবে দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে মিলনস্থল তৈরি করে তাঁরা সামাজিক ঐক্য নির্মাণ করেছিলেন এবং দ্রুতহারে ঘটে চলা ইসলামীকরণ রোধ করেছিলেন। তাঁদের রচিত ও বাণী ভারতীয় ভাষাসমূহকে পুষ্ট করেছে। তাঁরা অনেকেই দীর্ঘ পরিব্রাজনে বেরতেন দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জনগণের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কস্থাপন করতে ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে। সংকটময় পরিস্থিতিতে এইভাবে এই সন্তরা দেশ-সমাজ-ধর্মকে রক্ষা করেছেন এবং বর্তমান হিন্দুধর্ম ও ভারতবর্ষকে নতুন রূপ প্রদান করেছেন। এইজন্য ভক্তিপ্রচারকদের এই পরম্পরাকে 'আন্দোলন' বলে আখ্যায়িত করা হয়, কারণ তাঁরা বিভিন্নভাবে সমাজকে নাড়া দিয়েছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের এক উজ্জ্বল তারকা ছিলেন গুরু নানকদেব (১৪৬৯-১৫৩৯) যিনি তৎকালীন অখণ্ড পঞ্জাবের তালওয়াণ্ডী গ্রামে (বর্তমানে নানকনা সাহিব, পাকিস্তান) কার্তিক পূর্ণিমার দিনে জন্মগ্রহণ করেন। মেহতা কালু (কল্যাণ চাঁদ দাস) ও মাতা তৃপ্তা দেবীর এই পুত্রসন্তান শৈশব থেকেই অন্যদের থেকে পৃথক, যেন কোনো গভীর চিন্তায় মগ্ন এবং পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে উদাসীন। ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে সুলক্ষণী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় এবং তৎকালীন পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে কর্মরত ভগ্নীপতি জয়রামের কাছে কাজ করতে তাঁকে সুলতানপুরে প্রেরণ করা হয়।

সুলতানপুরে কর্মরত থাকাকালীন তিনি অনেকটা সময় পার্শ্ববর্তী নদীর তীরে সাধনায় মগ্ন থাকতেন। একদিন হঠাৎ তাঁকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনদিন পরে তিনি যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁকে দেখে সহজেই বোঝা গেল যে এই কদিনের মধ্যেই তাঁর চূড়ান্ত জ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটেছে। এই ঘটনার পর তিনি তাঁর বিখ্যাত পরিব্রাজনে বের হন, যাকে তাঁর শিষ্যপরম্পরায় 'উদাসী' বলা হয়।

গুরু নানকের 'উদাসী'

শিখ পরম্পরা অনুযায়ী গুরু নানকদেব চারটি দীর্ঘ যাত্রা বা 'উদাসী' সম্পন্ন করেছিলেন যার দ্বারা ২৮,০০০ কিলোমিটারের বেশি যাত্রাপথ পার হয়েছিলেন। চতুর্দিশায় ব্যাপ্ত তাঁর এই যাত্রাগুলি অধিকাংশ তাঁর মুসলমান ভক্ত ভাই মর্দানার সঙ্গে পায়ে হেঁটে তিনি সম্পন্ন করেছিলেন। প্রথম উদাসীতে বলা হয় যে তিনি লাহোর, কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার, প্রয়াগ, গয়া, অসম, ওড়িশা, বঙ্গপ্রদেশ জুড়ে সমগ্র পূর্ব ভারত যাত্রা করেছিলেন। অখণ্ড বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁর পদধূলির স্মৃতিবিজড়িত গুরুদ্বারা রয়েছে, যেমন ঢাকার নানকশাহী গুরুদ্বার,কলকাতার বড়বাজার গুরুদ্বারা, বর্ধমান নগর প্রভৃতি। ওড়িশার পুরীর সমুদ্রতটে স্থানীয় মানুষের পানীয় জলকষ্ট লক্ষ্য করে তিনি তাঁর দণ্ড দ্বারা কূপ খনন করেন যার থেকে মিষ্ট জল বেরয়। স্বর্গদ্বারের নিকটেই এইরূপ বর্তমানেও সচল এবং এই স্থানে আজকে নানকপন্থীদের বাউলি মঠ স্থাপিত। শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করে এবং সন্ধ্যারতি দেখে তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে মন্দিরদ্বার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি 'গগন মে থাল' নামক তাঁর বিখ্যাত ভজন রচনা করেছিলেন যার প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি :

গগন মে থালু রবি চন্দু দীপক।
বনে তারিকা মণ্ডল জানক মোতি।।

উল্লেখ্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমৃতসর দর্শনে এই আরতি শোনার পর এর সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ করেছিলেন এভাবে :

আকাশ হলো পূজার থাল
যাতে সূর্য ও চন্দ্র দিয়াস,
নক্ষত্রমণ্ডলের তারা হলো রত্ন,
চন্দনকাঠের সুগন্ধে ভরা বাতাস হলো স্বর্গীয় পাখা।
সব ফুলের মাঠ, বন দীপ্তি!
এ কি অপূর্ব পূজা, আহা!

ভয় নাশকারী, এই তোমার আরতি।

শ্রীমন্দিরের মূল প্রবেশদ্বারের বাহিরে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি এই ভজন রচনা করেছিলেন সেই স্থানে আজ নানকপন্থী উদাসী সম্প্রদায়ের মাঙ্গু মঠ বিরাজমান। এই দীর্ঘ যাত্রার প্রায় সাত বছর (১৫০০-১৫০৬) তিনি অতিবাহিত করেছিলেন।

দ্বিতীয় উদাসী (১৫০৬-১৫১৩) যাত্রাকালে তিনি ধনশ্রী উপত্যকা ও বর্তমান শ্রীলঙ্কা গিয়েছিলেন। এটিও সাত বছর ধরে চলেছিল। ১৫১৪ থেকে ১৫১৮ এই পাঁচ বছর ধরে তৃতীয় উদাসী চলে যার মধ্যে তিনি কাশ্মীর, সুমেরু পর্বত, নেপাল, তাসখণ্ড, সিকিম, তিব্বত, প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন। সুদূর সিকিমের গুরু দঙমার জলাশয়ে তাঁর নামাঙ্কিত গুরুদ্বার রয়েছে। ১৫১৯ থেকে ১৫২১ এই তিন বছর ধরে চতুর্থ উদাসীতে পশ্চিম এশিয়া ভ্রমণ করেন যার মধ্যে মক্কা, বাগদাদ্ প্রভৃতি দর্শন করেছিলেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দার্শনিক শিকড়কে অস্বীকার করলে আত্মপরিচয়েরই সংকট ঘটে। আজ শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে এই সংকট দৃশ্যমান।

উদাসী যাত্রাকালে সমগ্র ভারত এবং বাইরে পদব্রজে ভ্রমণ করে তিনি তৎকালীন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা লক্ষ্য করেন। তাঁর রচিত বাণীর মাধ্যমে তাঁর এই সমস্ত অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। আবার যাত্রাকালে বিভিন্ন অঞ্চলের সন্তগীতি তিনি সংগ্রহ করে তাঁর ভক্তশিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত করেছেন। এইভাবেই পরবর্তীকালে নামদেব, কবীর, রামানন্দ, ধন্না, জয়দেবের মতো সাধকদের রচনা গুরু গ্রন্থসাহিবে স্থান পেয়েছে।

উদাসীগুলি সম্পন্ন করে তিনি বর্তমান পাকিস্তানের করতারপুর নামক স্থানে বসবাস শুরু করেন। তাঁকে ঘিরে ভক্তমণ্ডলী গড়ে ওঠে এবং তাঁর অনুগামী অর্থাৎ নানকপন্থীদের নিয়ে তিনি প্রত্যহ কীর্তন ও ধর্মপ্রচার করতেন। মানুষে-মানুষে ব্যবধান মুছে ফেলার জন্য তিনি শিষ্যদের একত্রে ভোজন অর্থাৎ 'লঙ্গর' প্রথা চালু করেন যা আজও বিশ্বজুড়ে শিখ গুরুদ্বারার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরাম জন্মভূমি দর্শন

১৫১০-'১১ খ্রিস্টাব্দে গুরু নানকদেব দিল্লি, হরিদ্বার প্রভৃতি হয়ে অযোধ্যা পৌঁছেছিলেন এবং সেখানে শ্রীরামজন্মস্থানে মন্দির দর্শন করেছিলেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পারম্পরিক বর্ণনা যেগুলিকে 'জনমসাখী' (জন্মসাক্ষী) বলা হয় সেখানে আমরা এই দর্শনের উল্লেখ পাই। ভাই মন সিংহ-রচিত 'পোথি জনম সাখী'তে বর্ণনা আছে যে তিনি তাঁর যাত্রাসঙ্গী মর্দানাকে বলেছিলেন, 'মর্দানা! এহ্ অযুধিয়া নগরী শ্রীরামচন্দ্রজী কী হ্যায়। সো চল, ইসকা দর্শন করি।' বাবা সুখবাসী রাম-রচিত গ্রন্থেও এর উল্লেখ রয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাবরের আক্রমণ এবং শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংসের আগে সেখানে গুরু নানকের আগমন এবং মন্দির দর্শনের ঘটনা সাম্প্রতিককালে ভারতের উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শ্রীরামজন্মভূমি সংক্রান্ত মামলায় সেই স্থানের উপর রামলালার অধিকার রক্ষার পক্ষে উদ্ধৃত হয়। মামলাচলাকালীন শ্রীরামজন্মভূমি ন্যাসের পক্ষে আদালতে সাক্ষী দিয়েছিলেন শিখ গ্রন্থের বিশারদ শ্রীরাজেন্দ্র সিংহ। তিনি তাঁর বয়ানে এই ঘটনার উল্লেখ সংকলিত করে আদালতে পেশ করেছিলেন। এর থেকে প্রমাণ হয় যে বাবরের আগে সেখানে মন্দির ছিল এবং শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি-রূপেই এই স্থান খ্যাত ছিল। অবশেষে আদালতের চূড়ান্ত রায়ের মধ্যেও গুরু নানকের এই আগমন উল্লিখিত থাকে।

প্রসঙ্গত, দশম শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর রচিত 'বিচিত্র নাটক' গ্রন্থে লিখেছেন যে, শিখ গুরুরা সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর। গুরু নানকের বংশ শ্রীরামের পুত্র কুশের উত্তরপুরুষ। এইভাবে তিনি মর্যাদাপুরুষোত্তম অবতার পুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে শিখগুরু এবং শিখ পরম্পরার প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারের দাবি করেছেন। শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবে রামচন্দ্রের নাম ২৫০০-এর বেশি বার উল্লিখিত হয়েছে। অযোধ্যায় সরযূ নদীর তীরে যেখানে গুরু নানক বিশ্রাম করেছিলেন সেখানে বর্তমানে গুরুদ্বার ব্রহ্মকুণ্ড অবস্থিত রয়েছে। পরবর্তীকালে গুরু তেগবাহাদুর এবং গুরুগোবিন্দ সিংহ উভয়েই বিভিন্ন সময় অযোধ্যা পরিদর্শন করেছিলেন।

বাবরবাণী

মুঘল আক্রমণকারী বাবরের ভারত আক্রমণের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন গুরু নানক। পশ্চিম থেকে সমস্ত বৈদেশিক আক্রমণের ভুক্তভোগী পঞ্জাব হয়েই দিল্লি প্রবেশের পথ এবং বরাবরের মতো এই আক্রমণের ফলে পঞ্জাবের মানুষের হাহাকার গুরু নানকের হৃদয় বিদীর্ণ করে। হত্যা-ধর্ষণ- লুণ্ঠন-নিপীড়নের বাড়বাড়ন্ত তিনি তাঁর সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের দুর্দশা বিশেষ করে নারীদের ওপর অত্যাচার তাঁকে এতটাই ব্যথিত করেছিল যে হিজলি হত্যাকাণ্ডের পর রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিধাতাকেও প্রশ্নের সম্মুখে ফেলেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে মৃত্যুর দূতরূপী মুঘলদের হিন্দুস্থানে প্রেরণ করে এত নরহত্যা, এত দুর্দশার পরও কি তিনি করুণা অনুভব করেননি?

কথিত আছে যে বাবরের আক্রমণের সময় গুরু নানক, এবং ভাই মর্দানাও সঈদপুরে অল্পকালের জন্য বন্দি হয়েছিলেন। মুঘল আক্রমণ ও অত্যাচার সম্বন্ধে তিনি চারটি কবিতা লিখেছিলেন যার একটি পঙ্‌ক্তিতে তিনি লিখেছেন, 'বাবরবাণী ফিরি গল কুইরুনা রোট খাই' (বাবরের অত্যাচারে সমৃদ্ধরাও অনাহারে আছে)। এই শব্দবন্ধ থেকে এই চারটি কবিতার একত্রিতভাবে নাম হয় 'বাবরবাণী' যা পরবর্তীতে গুরু গ্রন্থ সাহিবে স্থান পায়।

বাবরবাণীতে তিনি বলেছেন, 'খুরাসান খসমানা কিয়া হিন্দুস্থানু ডরাইয়া। আপে দোষু ন দেই করতা জমু করি মুঘলু চড়াইয়া'।

(খুরাসান দখল করে বাবর হিন্দুস্তানকে ত্রস্ত করল, মৃত্যুর দূত রূপে মুসলমানরা এল)

এরপর তিনি বলছেন এত হত্যা এত দুর্দশা সত্ত্বেও কর্তা তোমার করুণা এল না?

তুমি তো সকলেরই কর্তা
শক্ত যদি শক্তকে মারে
দুঃখ পায় না কেউ
কিন্তু যদি সিংহ ভেড়ার দলকে মারে,
তখন তার উত্তর তোমাকে দিতে হয়...

'রতন বিগড়ী ভিগোয়ে কুত্তিন মুইয়া সার ন কোঈ... (এই রত্নের দেশ কুকুরদ্বারা তছনছ হয়েছে, এতটাই যে মৃতদেরও কেউ আর দেখে না)

আবার এই বাবরবাণীতেই তিনি বলছেন,
ইকনা ওয়খত খুবই অহি ইকনাহা পূজা জাই,
চৌকে বিণু হিন্দওয়ন্দীয়াঁ কিউ,
টীকে কড়াই নঈ,
রাম না কভু চেতিয়ো হুনি, কহনি না মিলে খুদাই।
(নির্দিষ্ট সময়ে পূজা করা যায় না,
হিন্দুরা স্নান করতে পারছে না,
তিলক ধারণ করতে পারছে না,
যারা কখনও রামনাম উচ্চারণ করেনি,
তারা খুদার নাম নিয়েও রেহাই পাচ্ছে না)

এইভাবে গুরুনানকের 'বাবরবাণী' মুঘল অত্যাচারের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য বহন করে এবং তৎকালীন হিন্দু সমাজের চরম দুর্দশার কথা আজও আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে।

ধর্ম সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক

মধ্যযুগের এই বিদেশি-বিধর্মী শাসনকালে যখন ভারতের সনাতন ধর্ম অস্তিত্বের সংকটের সম্মুখীন তখন গুরুনানক হিন্দু ধর্মের সংস্কার ঘটিয়ে, জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ দূর করে, সাধারণের ভাষায় ধর্মপ্রচার করে সনাতন ধর্মকে যুগোপোযোগী করে তুলেছিলেন; নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্ণের মানুষকে সঙ্গে করে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। 'ভাণ্ড চাকো' (দান কর), 'কীরত করো' (কীর্তি/কর্ম কর) এবং 'নাম জপো'— এই তিনটি সহজ বিধানের মাধ্যমে দিশাহারা মানুষকে তিনি বেঁচে থাকার মন্ত্র প্রদান করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শিষ্যভক্ত বৃদ্ধি হয় শুধু পঞ্জাব নয় ভারতের অন্যান্য প্রান্তেও এবং পরবর্তীতে নানকপন্থী/শিখ সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। তাঁর শিষ্য তাই লেহ্নাকে তিনি 'অঙ্গদ' (অর্থাৎ তাঁরই অঙ্গ) নামকরণ করে পরবর্তী গুরুরূপে মনোনীত করেছিলেন। গুরু নানকের দুই পুত্র শ্রীচাঁদ এবং লক্ষ্মীচাঁদ, যার মধ্যে বাবা শ্রীচাঁদ সংসার ত্যাগ করে যোগসাধনার মার্গে প্রবৃত্ত হন। তিনি উদাসীন সাধু সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন যাঁরা বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে নানকপন্থী ধর্মমত সারা ভারতবর্ষে প্রচার করেন এবং শিখ গুরুদ্বারাগুলির সংরক্ষণ করেন। ব্রিটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত নানকপন্থার নেতৃত্ব পারম্পরিকভাবে এই উদাসী সাধুদের হাতেই ছিল। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রের ফলে তাঁদের গুরুদ্বারাগুলি থেকে উৎখাত করা হয়।

গুরু নানকের উত্তরসূরিরা প্রথমে সাধনা বলে বলীয়ান হয়ে মুঘল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব জাহাঙ্গির-দ্বারা নিহত হওয়ার পর ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ 'মীরী' আর 'পীরী' (জাগতিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি) একত্রিত করে এই দুই শক্তির প্রতীকরূপে দুটি তরবারি একসঙ্গে ধারণ করেন। হিন্দু সমাজের রক্ষার্থে বলপূর্বক ইসলামীকরণের প্রতিরোধে নবম গুরুগোবিন্দ সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্র দশম গুরু তেগবাহাদুর মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। গুরু নানক ও তাঁর পরম্পরার জন্যই পঞ্জাব এবং বৃহত্তর উত্তর ভারত রক্ষিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতি বৃদ্ধি ও পুষ্ট হয়েছিল।

ব্রিটিশ প্রভাবিত কিছু আধুনিক লেখকরা মনে করেন যে গুরু নানকদেব বৈদান্তিক হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর জীবন, কর্ম ও বাণীর বিশ্লেষণ করলে এই ধরনের ব্যাখ্যা ধোপে টেকে না। তিনি কোনো নতুন ধর্মমতের সৃষ্টি করেননি, বরং কবীর ও দাদু দয়ালের মতোই নির্গুণ সন্তমতকে তাঁর বাণীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন, যা বৈদান্তিক দর্শন থেকেই উৎপন্ন। তাঁর রচিত যে ৯৬৪টি 'শব্দ' বা গান গুরু গ্রন্থসাহিবে সংকলিত সেখানে এই বৈদান্তিক দর্শনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর 'এক ওঙ্কার'-এর মধ্যে অদ্বৈতবাদী দর্শন রয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে দার্শনিক শিকড়কে অস্বীকার করলে আত্মপরিচয়েরই সংকট ঘটে। আজ শিখ সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যে এই সংকট দৃশ্যমান। আশা করা যায় যে গুরু নানক এবং সমস্ত গুরুদের প্রকৃত ঐতিহ্য অনুধাবন করে এই পথভ্রষ্ট অংশ বৃহৎ ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরারূপী তাদের প্রাপ্য উত্তরাধিকারের সঙ্গে শীঘ্রই পুনর্মিলিত হবে। □

With Best Compliments from-

A
Well Wisher

বাম জামানা থেকেই অস্বাস্থ্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জিঘাংসার বলি হচ্ছেন অভয়ারা

সাধন কুমার পাল

গত ৪ নভেম্বর শিয়ালদা কোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আরজি কর কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় চিৎকার করে সাংবাদিকদের বলছিল যে 'আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। আমি খুন ও ধর্ষণ করিনি। সরকার আমাকে ফাঁসিয়েছে। এতদিন আমি চুপচাপ ছিলাম।' সঞ্জয় রায় ধনঞ্জয় হতে পারে এমন আলোচনা ও আশঙ্কা অনেকদিন ধরেই মিডিয়াতে ঘোরাফেরা করছিল। রাজ্য সরকারের ভূমিকা, তদন্তের গতিপ্রকৃতি, সেই সঙ্গে সঞ্জয় রায়ের বক্তব্য ন্যায়বিচার নিয়ে মানুষের সন্দেহকে নতুন করে উসকে দিয়েছে।

তখন আরজি কর নিয়ে মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসন টলমল। সারা রাজ্য তখন উত্তাল। এদিকে জুনিয়র ডাক্তাররাও পথে নেমেছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের এজলাসে উঠেছিল আরজি কর মামলা। ঘটনার মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় বিচারপতি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে কোনো পক্ষের অবশ্য কোনো আপত্তি ছিল না। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্টে নিজের এজলাসে টেনে নিয়ে গেলেন। সাধারণ মানুষকেও বলতে শোনা গেছে আরজি কর মামলা হিমঘরে ঢুকে গেল। কারণ বিচারপতি চন্দ্রচূড়ের সঙ্গে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নাকি অত্যন্ত ভালো সম্পর্ক।

গত ১০ নভেম্বর বিচারপতি চন্দ্রচূড় অবসর গ্রহণ করলেন। কিন্তু তার আগে তিনি আরজি কর মামলার গুরুত্ব ও বিচার বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস টলিয়ে দিয়ে গেলেন। গত ৫ নভেম্বর আরজি কর মামলার শুনানি ছিল। প্রধান বিচারপতি অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত থাকায় সেই দিন শুনানি বাতিল হয়ে গেল। পরের দিন সকালে বা বিকেলে আরজি কর মামলার শুনানি হলো না। কারণ প্রধান বিচারপতি ব্যস্ত। ৭ নভেম্বর বেলা দুটোর সময় সুপ্রিম কোর্টে মামলা উঠলো। মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেই মামলা শুনানির কাজ শেষ করলেন। বিচারপতি বললেন ট্রায়াল শুরু হয়েছে শিয়ালদা আদালতে, আপনারা ভরসা রাখুন। মাত্র আধ ঘণ্টায় জীবন থেকে আরজি কর প্রসঙ্গ শেষ করলেন বিচারপতি চন্দ্রচূড়। যারা আশা করেছিলেন সুপ্রিম কোর্ট সিবিআইকে এমন কিছু নির্দেশ দেবেন যাতে এই তদন্ত সংস্থা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারবে। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল মানুষের আন্দোলনের জেরে টলমল রাজ্য সরকারের গায়ে যাতে কোনো আঁচ না আসে পরোক্ষে আপাতত সেই ব্যবস্থাই করে গেলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

আরও একবার বোধহয় এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে মামলায় অভিযোগের আঙুল উঠছে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তিনি ক্ষমতায় টিকে থাকলে এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচার কোনোভাবেই সম্ভব নয়। ঠিক এই যুক্তিতেই হয়তো ভারতীয় জনতা পার্টির সেই বিখ্যাত স্লোগান মানুষের মনকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, 'দফা এক দাবি এক, মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ'। তবে বামপন্থীরা অবশ্য নানাভাবে মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগের দাবিকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাতে অনেকটা সফল হয়েছে, এটা বলা যায়। বামেদের এই ধরনের প্রয়াসের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন ৩৪ বছরের বাম আমলে মানুষ দেখেছে এই ধরনের ধর্ষণের ঘটনা বামেদের কাছে বিরোধীদের দমন করার অস্ত্র কিংবা রাজনৈতিক ইস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্থান-কাল-পাত্র পৃথক হলেও গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা এবং ১৯৯০ সালের ৩০ মে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জামানার বানতলা গণধর্ষণ কাণ্ডের কার্যকারণ সম্পর্ক হুবহু এক। আরজি করের ঘটনাটি রাত ৩টা থেকে ৬টার মধ্যে ঘটনাটি ঘটে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভুক্তভোগী ছিলেন একজন পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষানবিশ ডাক্তার, যিনি ওই রাতে ডিউটিতে ছিলেন। ভোরের দিকে, হাসপাতালের সেমিনার রুমে তার মৃতদেহ

পাওয়া যায়।

অটোপসি রিপোর্টে জানা যায় যে ভুক্তভোগীকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় এবং তার শরীরে যৌন নির্যাতনের স্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া যায়। তার গলার অস্থি ভেঙে যাওয়া, মুখে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন এবং যৌনাঙ্গে গুরুতর আঘাতের চিহ্ন ছিল। এছাড়াও, তার শরীর থেকে রক্তপাত হচ্ছিল, যা যৌন নির্যাতনের প্রমাণ বহন করে। মৃতদেহের পোস্টমর্টেম রিপোর্টে ধর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। হতভাগী ডাক্তারের পারিবারিক সূত্র ও মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে তিনি ছিলেন এক প্রতিবাদী চরিত্রের মাথা উঁচু করে চলা মেধাবী কর্তব্যপরায়ণ স্বাধীনচেতা মহিলা। দেখতে সুন্দরী বা নারী হিসেবে শারীরিক আকর্ষণের জন্য আরজি করে ডাক্তার বোনকে ধর্ষিতা ও খুন হতে হয়েছে এমন কথা কিন্তু কেউ বলছেন না। তদন্তকারী সংস্থাগুলো দীর্ঘসময় তদন্ত করে ধর্ষক ও খুনিকে খুঁজে বের করতে না পারলেও খুনের কারণ নিয়ে কিন্তু কোনো সংশয় ও বিতর্ক নেই।

পারিবারিক সূত্র ও মিডিয়ার রিপোর্ট থেকে জানা যায় স্বাস্থ্য বিভাগ এবং আরজি কর হাসপাতালে দুর্নীতির অন্ধকার জগতের কুশীলবদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনে ফেলেছিলেন তিনি। স্বাস্থ্য বিভাগের দুর্নীতির পাহাড়ের উপর বসে থাকা আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সন্দীপ ঘোষের মতো কুশীলবরা কোনো আয়ারাম গয়ারাম নন, একেবারে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ। অভয়ার মতো এরকম 'বেয়ারা ডাক্তার' বেঁচে থাকলে বেআব্রু হয়ে যেতে পারে সততার প্রতীক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অন্ধকার জগতের কীর্তিকাহিনি। ফলস্বরূপ ঘটলো এই ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা।

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসন ছিল নারীর বিরুদ্ধে ভয়ংকর ও লাগামহীন অপরাধের উৎস স্থল। যেখানেই ধর্ষণের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে সেখানেই সরকারি তন্ত্র ধর্ষকদের বাঁচানোর জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। বিরোধী দলগুলির (কংগ্রেস এবং তারপর তৃণমূল কংগ্রেস) কর্মী ও সমর্থকদের মহিলাদের উপর হামলা ও ধর্ষণ ছিল বিরোধী দলকে দমন করার জন্য কমিউনিস্ট ক্যাডারদের একটি প্রিয় কৌশল। বিরোধী দলের কর্মী এবং সমর্থকদের পরিবারের মহিলারা খুনি কমিউনিস্ট ক্যাডার এবং সিপিআই(এম)-এর বিশাল হার্মাদবাহিনীর সফট্ টার্গেট ছিল।

১৯৯০ সালের ৩০ মে বানতলা ধর্ষণ এরকম একটি ভয়ংকর হামলা। গোসাবা রাঙাবেড়িয়া থেকে টিকাকরণ কর্মসূচি সেরে ফেরার পথে বানতলা রোডে একদল দুষ্কৃতীর হাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অতিরিক্ত জেলা গণমাধ্যম বিভাগের উপআধিকারিক অনিতা দেওয়ান, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের উচ্চপদস্থ আধিকারিক উমা ঘোষ এবং ইউনিসেফের বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নতুন দিল্লি কার্যালয়ের প্রতিনিধি রেণু ঘোষ ধর্ষিত হন। দুষ্কৃতীদের বাধা দিতে গিয়ে একজন আধিকারিক ও তাদের গাড়ির চালক নিহত হন। মহিলাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে ধানক্ষেতে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে গণধর্ষণ করা হয়। তিনজনের মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে মারা গেলেও বাকি দুজন বেঁচে যায়। একজন মহিলা ডাক্তার যিনি ময়নাতদন্ত চালাচ্ছিলেন, তিনি ধর্ষিতার গোপনাঙ্গে একটি ধাতব টর্চলাইট দেখে অজ্ঞান হয়ে যান।

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর প্রতিক্রিয়া ছিল, 'এমন ঘটনা ঘটেই থাকে', অথচ তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রশান্ত শূর এই তিন মহিলাকে স্থানীয়রা শিশু অপহরণকারী বলে ভুল করে আক্রমণ করেছিল বলে ঘটনার ন্যায্যতা দিয়েছেন। সেই সময়ের বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গিয়েছিল যে, দিল্লির সেই ইউনিসেফ অফিসার রাজ্যের টিকাকরণ কর্মসূচিতে কেলেঙ্কারি আবিষ্কার করেছিলেন, সেই কেলেঙ্কারি ধামাচাপা দেওয়ার জন্য সিপিআই(এম)-এর গুন্ডাদের ওই মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাসের নামে মহিলাদের উপর যে পাশবিক নির্যাতন হয়েছে তা তদন্ত করতে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মার নেতৃত্বে একটি দল সরেজমিনে তদন্ত করে যে রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন তাতে এটা স্পষ্ট যে মহিলাদের ওপর অপরাধ তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিশোধের অস্ত্র। তদন্ত কমিটি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। চেয়ারপারসন রেখা শর্মার অধীনে ঘটিত এনসিডব্লুউ কমিটির কিছু পর্যবেক্ষণ হলো :

১. রাজ্য সরকারের পুলিশ আধিকারিকরা রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কোনও চূড়ান্ত বা কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

২. সমস্ত রাজ্য সরকারি কর্তৃপক্ষ রাজ্যের নির্যাতিতা মহিলাদের সহায়তার আবেদনকে অবহেলা করছে।

৩. রাজ্যে দুর্দশাগ্রস্ত মহিলাদের জন্য কোনো কার্যকর পুনর্বাসন প্রকল্প নেই।

৪. রাজ্যের মহিলারা কথা বলতে এগিয়ে আসতে পারে না, তারা এই জন্যই ভয় পায় কারণ তারা জানে যে রাজ্য সরকার/পুলিশ কর্তৃপক্ষ কখনই তাদের সুরক্ষা প্রদান করবে না। এইভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা না থাকার অর্থ গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া।

৫. মানুষ এতটাই ভীত যে তারা অবাধে চলাফেরা করতে পারছে না এবং তাদের অনেকেই এখানে সেখানে আশ্রয় নিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে চলাফেরার স্বাধীনতা, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচার অধিকারের মতো মৌলিক অধিকার থেকে তাদের সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে।

৬. পুলিশ কর্মকর্তারা রাজ্যের মানুষকে রক্ষা করার পরিবর্তে গুন্ডাদের সমর্থন করছেন বলে মনে হচ্ছে।

৭. রাজ্যে শেল্টার হোম পাওয়া যায় না।

৮. পুলিশ কর্মকর্তারা মহিলাদের দেওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআরএস নথিভুক্ত করছেন না। কমিটি আরও তথ্য পেয়েছে যে অনেক আটকে পড়া নারী, যারা হিংসার শিকার হয়েছিল, তাদের বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়েছিল এবং আশ্রয়কেন্দ্রে থাকতে হয়েছিল; এবং এই মহিলাদের সঙ্গে দেখা করতে তদন্ত কমিটি কলকাতার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউতে মহেশ্বরী সদন পরিদর্শন করেছে। সেখানে প্রায় ২৫০-৩০০ লোক আটকা পড়েছিল, যার মধ্যে ৫০ জনেরও বেশি মহিলা ছিল। ভুক্তভোগী সকলের সঙ্গে কথা বলার পর, আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা নির্যাতিত নারীদের দ্বারা নিম্নোক্ত নৃশংসতা/অপরাধগুলো তুলে ধরা হয়েছে :

- টিএমসি গুন্ডাদের দ্বারা মহিলাদের উপর শারীরিক আক্রমণ। ভাঙচুর করা হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি। পরিবারের সকল সদস্যকে হত্যা করার জন্য তাদের বাড়িতে বোমা হামলা চালানো হয়।
- নারীরা প্রতিদিন ধর্ষণ ও হুমকির ফোন পাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নারী সুরক্ষার বেহাল অবস্থাকে ফেরাতে হলে সমাজের সর্বস্তরে সামাজিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক আন্দোলনের প্রয়োজন। এই ধরনের সর্বাত্মক আন্দোলনের জন্য নীতিনিষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যবস্থাও চাই। মমতা ব্যানার্জি বা বামেদের মতো রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের মডেল সামনে রেখে কখনোই সেই ধরনের সর্বাত্মক আন্দোলন সম্ভব বলে মনে হয় না।

বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কারণ কি?

আনন্দ মোহন দাস

বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বিতাড়নের লক্ষ্যে প্রশাসনিক সন্ত্রাস চরম আকার ধারণ করেছে। হিন্দু বিরোধী ও ভারত বিরোধী আওয়াজ ওঠায় সেদেশে হিন্দুরা এখন বিপন্ন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসারে সাড়ে সাত কোটি হিন্দুর ধর্মীয় অধিকারের কথা রয়েছে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এই কথাগুলির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ এবং আগেকার পূর্ব পাকিস্তান বর্তমানে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কারণে অন্যদিকে হাঁটছে বলে অভিযোগ উঠেছে, যদিও মুজিবের আশ্বাসের আগে থেকেই এই ধারা বয়ে চলেছে। এখনও ভারত বিরোধিতার সেই ধারা প্রবহমান। ২০১৯ সালে 'Hindu population growth in Bangladesh' নামে এক গবেষণায় হিন্দু জনসংখ্যা কমে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। একসময় বাংলাদেশের হিন্দু জনসংখ্যা সেদেশের এক পঞ্চমাংশের বেশি ছিল, এখন তা কমে বাংলাদেশের জনসংখ্যার আট শতাংশ নেই। নীচে জনসংখ্যার একটি পরিসংখ্যান থেকে বুঝতে সুবিধা হবে।

সাল	মুসলমান(%)	হিন্দু (%)
১৯৫১	৭৬.৯	২২
১৯৮১	৮৬.৫	১২.৩
২০১১	৯০.৪	৮.৫
২০২২	৯১.০	৭.৯

উপরোক্ত তথ্য অনুযায়ী সহজেই অনুমেয় যে মুসলমান জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে এবং হিন্দু জনসংখ্যা দ্রুত হ্রাস পেয়ে ৭.৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

১৮৫১ সালের পর হিন্দুদের মোট জনসংখ্যা হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তুলনায় মোট মুসলমান জনসংখ্যা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে।

১৯৫১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল ৯.৭ মিলিয়ন, তা ২০২২ সালে ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩.১ মিলিয়ন। সেক্ষেত্রে মুসলমান জনসংখ্যা ৩৪ মিলিয়ন থেকে ৩৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫০ মিলিয়নে দাঁড়িয়ে। দেখা যাচ্ছে, হিন্দু জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানদের চেয়ে স্বাভাবিকভাবেই পিছিয়ে পড়ছে। প্রথমে হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার মূল কারণ ছিল দেশত্যাগ (এক্সোডাস), কিন্তু বর্তমানে আরও অনেক কারণ রয়েছে। মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুদের জন্মের হার কম এবং মৃত্যুর হার বেশি।

তথ্য অনুসারে দেখা যায়, এক হাজার জনসংখ্যা পিছু হিন্দুদের জন্মের হার ২২ জন, কিন্তু মুসলমানদের জন্মের হার ২৫.৩ জন। তাছাড়া হিন্দুদের প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ৭.৭ জন, মুসলমানদের ৭.২ জন। আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতি হাজারে মাইগ্রেশন হিন্দুদের ৬.৯ জন, কিন্তু মুসলমানদের ২.৭ জন। এর ফলে মুসলমানদের তুলনায় হিন্দু জনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। প্রথমদিকে হিন্দু এক্সোডাস বিপুল পরিমাণে হলেও তা ছিল আর্থিক কারণ বিবর্জিত। কিন্তু বর্তমানে তা অর্থনৈতিক কারণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান অনুপ্রবেশ বেশি আর্থিক কারণে এবং এছাড়া অন্যান্য কারণও তার মধ্যে রয়েছে।

সাল	আর্থিক কারণ	অন্য কারণ
১৯৮৯-৯২	১৮ শতাংশ	৮২ শতাংশ
১৯৯৩-৯৬	৫০ শতাংশ	
৯৭-২০০০	৫৪ শতাংশ	
২০০১-০৪	৫৮ শতাংশ	
২০০৫-১২	৭৪ শতাংশ	
২০১৩-১৬	৭৮ শতাংশ	১২ শতাংশ

ওই সময়ে মুসলমানরা আর্থিক কারণে ৯৭ শতাংশ অনুপ্রবেশ করেছিল। বেশিরভাগ হিন্দু ভারতে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৯৮৯-২০০৪ সাল পর্যন্ত ৮৮ শতাংশ হিন্দু শরণার্থী হিসেবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং ২০০৫-১৬ সাল পর্যন্ত ৩১.৩ শতাংশ ভারতে আসতে বাধ্য হয়েছে। বাকি অংশ ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে চলে গিয়েছে। মুসলমানরা অধিকাংশ উপসাগরীয় দেশগুলিকে বেছে নিয়েছে। তথ্য অনুযায়ী ২০০৫-১৬ সালে তুলনামূলকভাবে হিন্দু এক্সোডাস একটু কমেছিল। তাছাড়া হিন্দুদের জন্মের হার মুসলমানদের চেয়ে অনেক কম। ১৯৯৩-৯৪ সালে হিন্দুদের জন্মের হার ছিল ৩৫.৩ শতাংশ যা ২০১৪ সালে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.৪ শতাংশ, কিন্তু মুসলমানদের ১৯৯৩-৯৪ সালে জন্মের হার ছিল ৩৮.১ শতাংশ তা ২০১৪ সালে দাঁড়ায় ২৬.৪ শতাংশ। সুতরাং মুসলমানদের জন্মের হার হিন্দুদের চেয়ে হ্রাস পেয়েছে অনেক কম।

হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ার আর একটি কারণ হলো হিন্দুরা দেরীতে বিয়ে করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য জন্মনিরোধক পিল ব্যবহার করে বেশি। এছাড়াও দেখা গেছে হিন্দুদের মৃত্যুর হার মুসলমানদের চেয়ে বেশি। প্রতি হাজারে হিন্দুদের মৃত্যু হয় ৭.৭ জন কিন্তু মুসলমানদের মৃত্যু হয় ৭.২ জন। সুতরাং সামান্য হলেও হিন্দুদের মৃত্যুর হার বেশি।

কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পটপরিবর্তনে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অকথ্য নির্যাতন ও নিপীড়ন করা হয়েছে। মহিলাদের ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে। মঠ-মন্দির ধ্বংস করে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করে হিন্দু বিতাড়নের রাস্তা পরিষ্কার করা হয়েছে। কালক্রমে এদের আন্দোলন হিন্দু বিদ্বেষী আন্দোলন রূপে দেখা দিয়েছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের বাংলাদেশ ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। মহম্মদ ইউনুসের তত্ত্বাবধানে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলেও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন এখনও বন্ধ হয়নি। এখন আবার নতুন ফতোয়া জারি হয়েছে আজান বা নমাজের সময় দুর্গাপূজায় ঢাক বাজানো বন্ধ রাখতে হবে। অর্থাৎ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের মর্যাদা রয়েছে হিন্দুদের। আবার বেছে বেছে হিন্দু চাকরিজীবীদের চাকরিও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

কোথায় গেলেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যারা গাজা, প্যালেস্টাইনের উপর হামলার বিরুদ্ধে মোমবাতি নিয়ে প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন, কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে মূক ও বধির হয়ে থাকেন? চে গুয়েভারা, মার্কস, লেনিনের পোষ্যপুত্ররাও গাজা, প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেন অথচ পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে নীরব থাকেন। এই হলো এদের দ্বিচারিতা। তাই সময় এসেছে এই মার্কস-লেনিনের প্রেতাত্মাদের চিনে নিন এবং এদের মুখোশ খুলে দিন। কিছুদিন আগে বাংলাদেশি মুসলমানরা ত্রিপুরার কোনো নদী থেকে জল ছাড়ার পর বাংলাদেশ ভেসে গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভারতবিদ্বেষী অপপ্রচার চালানো হয়েছে এবং হিন্দুদের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যদিও ভারত সরকার এই মিথ্যাপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার চলেছে বাংলাদেশের অলিতে গলিতে। তাই ভারতের হিন্দুদের বাংলাদেশের হিন্দুদের লড়াইয়ে পাশে থেকে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে হবে। অন্যথায় হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে পলায়ন করতে বাধ্য হবে বা নতুন হোমল্যান্ড দাবি করবে। ভারত সরকারকেও বাংলাদেশি হিন্দুদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে জোরালো প্রতিবাদ করে এই সমস্যার সুরাহা করতে হবে। তা নাহলে বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ভবিষ্যতে আরও কমতে থাকবে। □

গুরু নানকদেব প্রবর্তিত পন্থ হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ

সরোজ চক্রবর্তী

জাতির জীবন যখন ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, যখন দিকে দিকে অন্যায় ও অসত্যের রাহুগ্রাস, প্রবলের সীমাহীন ঔদ্ধত্য, নিপীড়নের অবাধ প্রমত্ততা, হিংসার বিষময় উল্লাস, মানুষ যখন উদ্‌ভ্রান্ত, পথহারা, তখনই আসে জাতির মুক্তির শুভ মুহূর্ত। আসে মহাজন্মের লগ্ন। আবির্ভূত হন জ্যোতির্ময় পুরুষ। তাঁরাই জাতির জীবনে মুক্তির দূত। ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ। যুগে যুগে তাঁরাই আলোক পথের দিশারী। ঈশ্বরপুত্র পরম করুণাময় গুরু নানকদেবও একদিন তমসাচ্ছন্ন, হিংসায় উন্মত্ত ধূলির ধরণীতে জন্ম নিয়েছিলেন। মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অমৃতের পাত্র।

ভক্তিবাদের অন্যতম ধারক ও বাহক গুরু নানকজী ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি একজন ব্যবসায়ীর পুত্র। পার্শি ভাষা শিক্ষালাভের পর পৈর্তৃক পেশায় হিসাবরক্ষকের কাজে যোগ দেন। শৈশব থেকেই তাঁর ধর্মে আসক্তি ছিল। হিসাবরক্ষকের কাজ করবার সময় তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। ২৭ বছর বয়সেই গৃহত্যাগ করেন। তিনি নিজেই স্তোত্র রচনা করতেন এবং বাবার যন্ত্রের সহায়তায় গান গাইতেন। 'ঈশ্বর এক এবং অনন্য' সদগুরুর উপদেশ মেনে ধর্মীয় পথ অবলম্বনই তাঁর প্রবর্তিত ধর্মনীতির মূল কথা ছিল। তবে এই ধর্মনীতির বহু আগে হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নানকজী যে পন্থ প্রবর্তন করেছিলেন তাকে শিখপন্থ বলা হলেও আসলে তিনি কিন্তু 'হিন্দু'ই ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের বেশ কিছু অংশ সংস্কার করে শিখ পন্থের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে হিন্দুধর্মের সঙ্গে শিখপন্থের অসংখ্য সাদৃশ্য পাওয়া যায়। আসলে একেশ্বরবাদ ও নিরাকার সাধনা সনাতন হিন্দু ধর্মে ছিল। এই পৃথিবীতে সব থেকে পুরানো ধর্ম হলো 'সনাতন ধর্ম'। সনাতন হিন্দুধর্ম ব্যক্তিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সনাতন হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ হিসাবে 'বেদ' রয়েছে। এই 'বেদ' কোনো পুরুষ কর্তৃক সৃষ্টি হয়নি বলে তাকে 'অপৌরুষেয়' বলা হয়। সময় যত এগিয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্মের সংস্কারও তত ঘটেছে।

এক এক সময়ে এক একজন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ এসে সনাতন হিন্দু ধর্মকে সময়োপযোগী করে আধুনিক করেছেন। বিভিন্ন সংস্কার পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করেছেন। এই সংস্কারিত ধর্মনীতিগুলি বিভিন্ন সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য পেয়ে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন মত ও পথ। তেমনই একটি হলো 'শিখ পন্থ'। শিখপন্থ হিন্দুধর্মেরই অঙ্গ। কারণ সদ্‌গুরু নানকজী তিনি তাঁর মত প্রচারিত করেছিলেন। সেই মতাবলম্বী সম্প্রদায়কে শিখ সম্প্রদায় বলা হয়। তাই গুরু নানকের প্রচারিত মত সনাতন ধর্ম থেকেই এসেছে। শুধু শিখ নয়, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব-সহ বিভিন্ন যে মত ও পরম্পরা রয়েছে সেগুলি ব্যতীত ইসলামি মজহব বা খ্রিস্টমত কোনো না কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত ধর্মের সেই ব্যক্তির 'মত'টিই প্রচারিত হয়েছে।

এই কারণেই ভারতের সমস্ত মত ও পথের মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এটা নিয়ে বিতর্ক করে বা এই প্রভাবকে অস্বীকার করে অযথা দ্বন্দ্ব বাড়ানো মূর্খতা। সনাতন হিন্দু ধর্ম মানুষের কল্যাণের জন্য মঙ্গলের জন্য আত্মোপলব্ধির জন্য। সনাতন হিন্দু ধর্মে মানবতার কথা বলা হয়। মুক্তির স্বাদ পাওয়া যায় সাধনার মাধ্যমে। তাই সেই দিক থেকে গুরু নানক যে সনাতন হিন্দু ধর্মসংস্কারক ছিলেন এটা বললে অত্যুক্তি হয় না।

নানক মানবিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। মানব সেবার উপর ভক্তদের গুরুত্ব দিতে বলেছিলেন। অস্পৃশ্যতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। মধ্যপন্থী ছিলেন নানক। সাংসারিক জীবন ও আধ্যাত্মিক জীবন একই সঙ্গে অতিবাহিত করার পক্ষে ছিলেন তিনি। তাঁর প্রবর্তিত মতই হলো শিখ পন্থ। শিখ কথার অর্থ হলো 'শিষ্য'। শিখ সমাজে তিনি গুরু নানক বলেই পরিচিত ছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাবও মিলনের উদ্যোগ এক নতুন ধারায় প্রবাহিত করবার প্রচেষ্টা বিভিন্ন সাধকরা চালিয়ে এসেছেন। ভালোবাসার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের উপাসনা করার প্রচেষ্টা এক সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রচেষ্টাই ইতিহাসে 'ভক্তি-আন্দোলন' বলে পরিচিত। ভক্তিবাদে ভগবান শ্রীবিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতাদের ভগবান রূপে আরাধনা করা হয়। ভক্তি ও ভালোবাসার মধ্যেই নিজেকে ভগবানের মধ্যে বিলীন করা সম্ভব--- একথাই ভক্তিবাদীরা প্রচার করতেন। ইসলামের সুফিবাদ মানুষকে মানুষরূপে স্বীকার করে নেয়। এই সমন্বয়ের প্রয়োজনেই হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা এক নতুন ভাবধারা উপলব্ধি করেন।

গুরু নানক বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করে একেশ্বরবাদের পক্ষে প্রচার করতে থাকেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান তিনি ঘুরে বেড়ান। ভারতের বাইরে দক্ষিণে শ্রীলঙ্কা, পশ্চিমে মক্কা-মদিনা পর্যন্ত তিনি ভ্রমণ করেন। ভগবানের উপসনা করাও মনকে পবিত্র রাখা ছিল তাঁর প্রচারিত শিখপন্থের মূলনীতি। ধর্মসহিষ্ণুতা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, সমস্ত মানুষের মধ্যে সমতার কথা তিনি প্রচার করতেন। জাতপাত কুপ্রথার বেড়াজাল তিনি মানতেন না। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের কুসংস্কার দূর করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। নানক হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের ওপর বিশেষ জোর দিতেন। হিন্দু ধর্মের মূল এবং প্রয়োজনীয় উপদেশগুলো গ্রহণ করে গুরু নানক একটি শিখপন্থ প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রবর্তিত এই শিখ পন্থের মূল দর্শন ভালোবাসা এবং সাম্য। শিখ পন্থের অনুসারীরা চুল ও দাড়ি কাটে না। হাতে বালা পরে। মাথায় পাগড়ী বাঁধে। গুরু নানক তাঁর পন্থ সম্পর্কীয় ধারণা ও বাণীগুলো প্রচারের জন্য গৃহত্যাগ করেন এবং কালক্রমে একজন সাত্ত্বিক পরমপুরুষ মহাত্মা তথা ঋষি হিসেবে পরিগণিত হন। তাঁকে পরমগুরুও বলা হয়ে থাকে।

গুরু নানক তাঁর অনুসারীদের উদ্দেশ্যে যে উপদেশামৃত ও মহামূল্য বাণী বিতরণ করতেন। সেইসব উপদেশাবলী ও বাণীর সংকলিত রূপ 'গুরু গ্রন্থসাহিব'। গুরু গ্রন্থসাহেব শিখদের কাছে মহা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত। শিখেরা নিজ বিশ্বাস ও আদর্শের ব্যাপারে যথেষ্ট রক্ষণশীল। তবে অন্য মতের প্রতি বিদ্বেষহীন। গুরু নানকদেবজী ১৫০৯ খিস্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে অনন্তের পথে যাত্রা করেন। অঙ্গদ নামে তাঁর এক শিষ্যকে পরবর্তী শিখগুরু রূপে মনোনীত করে যান তিনি। এরপর অমরদাস, রামদাস, অর্জুন, হরগোবিন্দ, হররাই, হরিকৃষাণ, তেগবাহাদুর শিখদের গুরু হন। তেগবাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের দশম ও শেষ গুরু ছিলেন। তিনি অতি কঠোর নিয়ম শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করে শিখ সম্প্রদায়কে সুসংহত শক্তিতে পরিণত করেন।

এই সুসংহত শক্তিকে ভাষার জন্য কুচক্রী শাসকগোষ্ঠী বারে বারে ছক কষেছে। হিন্দুধর্মকে দুর্বল করতে রাজনৈতিক চক্রান্ত চলেছে। ব্রিটিশরা বিশেষ করে এই হিন্দুধর্মকে পরিকল্পিত ভাবে ভাবতে চেয়েছে। কারণ তারা জানত, উত্তর পশ্চিম ভারতে হিন্দু ক্ষত্রিয় রাজাদের শক্তি খর্ব করতে হলে শিখ সম্প্রদায়কে আলাদা করে দিতে হবে। এই শিখ পন্থে ছিল বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তির ঐক্যের বার্তা। এই ঐক্যকে ইংরেজ শাসক খুবই ভয় পেত। ভারতের হিন্দুর রাজারা একতাবদ্ধ হয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ গোষণা করলে ব্রিটিশরাজের পতন অনিবার্য ছিল। তাই শিখ— বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব, শৈব, নাথ মতাবলম্বী ছাড়াও মুসলমানদের হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী করতে নানা পরিকল্পনা করেছিল কুচক্রী ইংরেজ শাসক।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গুরু নানক ধর্মসংস্কার আন্দোলনে চৈতন্যদেবের মতোই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, যা ইতিহাসে বৈপ্লবিক ভূমিকা বলেই পরিচিত। চৈতন্যদেবের নীতি আজও মানুষের মনে প্রেম ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু দেশ বিদেশের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক চক্রের কৌশলের ফলে গুরু নানকের শিষ্যদের একাংশ ভারতের জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করে 'খালিস্তান' দাবির প্রশ্ন তুলে যে অশান্ত পরিবেশ ভারতের বুকে সৃষ্টি করেছিল তাতে বিস্মিতই হতে হয়। অনেকে আবার মনে করেন, সেকথা ভাবলে গুরু নানকের প্রবর্তিত পন্থের অসারতাই প্রমাণ হয়। ভারতবর্ষে শিখ পন্থ ও গুরু নানকের ভূমিকা অপরিসীম। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে ও স্বাধীনতা পরবর্তী পন্থের পঞ্জাব, হরিয়ানা, জম্মু, কাশ্মীর-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শিখ সম্প্রদায় যে আদর্শ সেবা, সাহসিকতা, সুরক্ষা ও মানবতার উপর কাজ করে চলেছে, তা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশে এবারের হিন্দুহত্যা ১৯৬৯-এর চেয়েও ভয়াবহ

কতখানি হিংস্র পশুবৃত্তির প্রকাশ ঘটলে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা পুলিশকর্মীকে পিটিয়ে মারা যায়? ইতিহাসে এমন অমানবিক নৃশংসতার কথা দ্বিতীয়টি কারও জানা রয়েছে বলে মনে হয় না। কতখানি বীভৎস বা নির্মম হলে এমন সম্ভব? বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলের সময়ে সারা দেশে বহু থানায় পুলিশ বাহিনীর শতাধিক সদস্যকে পৈশাচিক ভাবে পুড়িয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এমনকী অনেক পুলিশ কর্মীকে মেরে টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। আগুনে ঝলসে যাওয়া মৃত পুলিশের দেহ দেখে হতবাক হয়েছে পৃথিবী! এ হত্যাকাণ্ড দেশটির স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকেও হার মানিয়েছে। এটি কোনো সুস্থ ও সভ্য মানুষের কাজ নয়। আরও অবাক করা ঘটনা হলো এই সমস্ত হত্যাকাণ্ডের সকল তথ্য লোপাট করা হয়েছে। একই সঙ্গে নিহত পুলিশ কর্মীদের পরিবারগুলিকেও ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অবাক করার বিষয় হলো এই সকল হত্যাকাণ্ডের যাতে কোনো বিচার না হয় সেই জন্য ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, নোবেলজয়ী, তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি জাতিসঙ্ঘের একটি মিটিঙে তার দেশে জেহাদি অভ্যুত্থানের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পুরো বিষয়টিই প্ল্যান বা ছক করে এগোনো হয়েছে। স্টেপ এক, দুই, তিন করে এগিয়ে এই অভ্যুত্থান ঘটানো হয়েছে বলে সেই মিটিঙে তিনি স্বীকারও করেছেন। এমনকী এই অপকর্মের বাহবা নিতে গিয়ে মাস্টার প্ল্যান বাস্তবায়নকারীদের পরিচয়ও দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। সবাই সেই সুবাদে সব কিছুই জানতে পেরেছে। তিনি এও বলেছেন যে ছাত্ররা তাকে নিয়োগ করেছে এবং এমন সুযোগ নাকি আর আসবে না। সে সুযোগ যাতে হাতছাড়া না হয় সে জন্য তিনি সাংবাদিক ডেকে অদ্ভুত সব অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বীরত্বও জাহির করেছেন। গোপনে বিদেশি অস্ত্রের মজুদ ঘটিয়ে, অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে ছাত্র-নামধারী তথাকথিত মেধাবীদের মাঠে নামিয়েছেন তিনি। তিনি সত্যিই অনেক বাহবা পাওয়ার যোগ্য! একটা নির্বাচিত সরকারের পতন ঘটিয়ে, রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে তাঁর বিদেশি প্রভুদের তিনি খুশি করেছেন।

আসলে সকল কর্মকাণ্ডই হয়েছে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান-সহ সংখ্যায় কম জনগোষ্ঠীগুলিকে তাড়িয়ে, গনিমতের মাল বানানোর ফতোয়া দিয়ে লুঠপাট করে খাওয়ার ধান্দায়। বিগতদিনেও নানা কায়দায়, বিভিন্ন ঘটনা ঘটিয়ে সংখ্যালঘুদের উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে, কিন্তু এইবারের প্রেক্ষাপট ভিন্নরূপ নিয়েছে। হিন্দুরা এবার মাথা উঁচু করে প্রতিরোধের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ইসকন ও সনাতনী জাগরণ মঞ্চের নেতৃত্বে চলছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। পরিণামে প্রশাসনিক তরফে নেমে এসেছে ব্যাপক দমন পীড়ন। গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাজারি গলিতে হিন্দুদের প্রতিবাদ সমাবেশে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নির্বিচারে গুলি চালায়। গুলি চালনার ফলে কতজন মানুষ আহত বা নিহত হয়েছেন তার সঠিক সংবাদও পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম চেপে দিচ্ছে অধিকাংশ খবর। জামায়াত দাবি তুলেছে ইসকনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার। যদিও আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে জয়ী হওয়ার পর কত ধানে কত চাল হয় সে অঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন ড. ইউনুস!

বাংলাদেশ জুড়ে হিন্দুদের উপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে। প্রধান উপদেষ্টার প্রশ্রয়ে দেশটিতে হিন্দুদের উপর যারপরনাই অত্যাচার সংঘটিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শাসন ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে দৃশ্যত। এরই মধ্যে পিতৃ পরিচয়হীন দু'একটা হিন্দু পরিচয়ধারী দালালও দেখি বিড়ালের মতো মিউ মিউ করে চলেছে। এর মধ্যে জালিয়াত পিনাকী ভট্টাচার্য এবং অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিকের নাম বহুল প্রচারিত। পিনাকী মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে নানা চাপে ও বাধ্যবাধকতায় হিন্দুবিরোধী কথাবার্তা প্রচার এবং কাজকর্মে লিপ্ত। তার ভাবটা এমন যে মনে হয় তার কথাতেই বাংলাদেশ চলবে। অবৈধ ওষুধ ব্যবসা করতে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় গ্রেফতারি এড়িয়ে গিয়েছে এই হিন্দুবিরোধী দালাল। এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে গোবিন্দ। অবশ্য গোবিন্দ টাকা খেয়ে দালালি পেশায় নিয়োজিত ছিল সেটা অনেকেরই জানা ছিল না। তবে মিরজাফরেরা এইভাবেই নিজেদের স্বার্থে সব কিছু করতে পারে। আজকে এই দুই দালালের চরিত্র সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশ জুড়ে সাম্প্রতিক নৃশংসতার ক্ষেত্রে শুধু পুলিশই নয়, শিশু-বালিকারাও জেহাদিদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ১৯৬৯-'৭১ পর্যায়ে পাকিস্তানিরা যে কায়দায় মানুষকে নির্যাতন করেছিল, যে ভয়াবহ গণহত্যা চালিয়েছিল, ইউনুস প্রশাসন যেন তার চেয়েও বেশি নৃশংসতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

—সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী,
আগরতলা, ত্রিপুরা।

নব্য না প্রাচীন—রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে নিদান দিলেন শাসক দলের মুখপাত্র

রাজ্যের শাসন ক্ষমতার কুর্সিতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর পরবর্তীতে তার দলের কে আসীন হবেন, তা এক সাংবাদিক কুলশিরোমণি এবং পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের মুখপাত্র ইতিমধ্যেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, তিনি আবার এক সময়ে রাজ্যের শাসকদলের সুপ্রিমোকে গালমন্দ, এমনকী চোর বলতেও জিভে কামড় খাননি। হয়তো তিনি এই সংকল্প নিয়েই শাসকদলে আবার কল্কে পাওয়ার জন্য যা যা করতে হয়, সেগুলি করে চলেছেন। কী সেই সংকল্প? রাজ্যের শাসকদলের সুপ্রিমোকে যে করেই

ফঃ ৩

হোক ক্ষমতাচ্যুত করা। তাঁর হয়তো সেই মনে পোষা রাগ, যে রাগ সারদা মামলায় তার জেলে যাওয়ার সময়ে হয়তো সামান্য উগরে দিয়েছিলেন। যাই হোক, তিনিই মনে হচ্ছে এখন রাজ্যের রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া শাসক দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের চালক। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে তিনিই হয়তো ভবিষ্যতে হবেন কফিনের শেষ পেরেকের হ্যামার ম্যান! অবশ্য দুর্জনেরা কত কথাই না বলেন। এদিকে রাজ্যের শাসনযন্ত্রে যে ঘুণ ধরে গিয়েছে, সেটা মনে হয় শাসক দলের মাথারা টের পেয়ে গিয়েছে। বাহুবলীদের দিয়ে ভোটযুদ্ধ জিতলেও, তাঁদের পাশে যে সাধারণ মানুষ নেই, সেটা অভয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়ে সংগঠিত আন্দোলনে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ দেখে তারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। এখন দেখার যে সাধারণ মানুষ আগামীদিনে এদের কতটা বর্জন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো ইতিমধ্যেই নিজের টিম তৈরি করতে শুরু করেছেন বলে খবর। এমনকী তিনি সুপ্রিমোর হাতে একটি রাজ্যের বিভিন্ন কমিটিতে থাকা পদাধিকারীদের পরিবর্তনের কথাও প্রস্তাব আকারে দিয়েছেন। এদিকে উল্লসিত ভাইপোপন্থীরাও ঘুঁটি সাজাতে শুরু করে দিয়েছে। হয়তো সেই বিষয়টায় গতি আনতে ভাইপো ফের কোনো জোয়ার যাত্রা শুরু করতে পারেন--- এমনটাই জানাচ্ছে রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র। অপর দিকে পুরনোপন্থী, মানে সুপ্রিমোপন্থীরা আকাশে কালো মেঘ দেখছে যে এবার তারা হয়তো অস্তিত্বের সংকটে পড়তে পারে। ইদানীং তারা এইসব চিন্তাভাবনা শুরু করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্র জানাচ্ছে, কিন্তু তারাও যে বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র মেদিনী ছাড়বে না সেটাও ঘনিষ্ঠ মহলে আলোচনা করেছে বলে জানিয়েছে আরেকটি সূত্র।

এদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন পরিচালনা-সহ সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যর্থতার একটা ছবি জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছে। 'দুর্নীতি' ও 'চুরি' শব্দ দু'টিও রাজ্যের শাসক দলের সমস্ত কিছুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াতে দল ও সরকারের ভাবমূর্তির যা অবস্থা, তা সহজেই অনুমেয়। এই ভাবমূর্তিতে যে আর লক্ষ্মীর ভাণ্ডার খুব একটা খাবে না, সেটাও হয়তো বুঝে গিয়েছেন শাসক দলের কর্তাব্যক্তিরা। এই পরিস্থিতিতে কী স্ট্র্যাটেজি নিতে পারে শাসক দল? একটি সূত্র জানাচ্ছে যে উন্নয়ন এবং নানা পুরস্কারপ্রাপ্তিকে সামনে আনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন স্বীকৃতিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে দলীয় ও সরকারি প্রচারে। চাকরির ক্ষেত্রে— সে শিক্ষা বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেই হোক না কেন, কিছু লোককে নিয়োগ করে একটা স্বচ্ছতার নাটক বা গিমিক তৈরি করা হবে। আবাসন নিয়েও কিছু নাটক থাকবে। থাকবে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফাটা রেকর্ড। ইন্ডিজোটের বাধ্যবাধকতায় এবারে যতটা না বামপন্থীদের আক্রমণ করা হবে, তার থেকে বেশি আক্রমণ শানানো হবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দলের বিরুদ্ধে। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি দেখাতে হয়তো বলির পাঁঠা করা হতে পারে বেশ কিছু চরম দুর্নীতিগ্রস্ত নেতাকে। আবার বিতর্কিত নানা বিষয়কে দূরে রেখে, একেবারে নতুন বিষয় এনে মানুষের মনের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হতে পারে। ওই সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে রাজ্যের শাসক দলের কোর কমিটির মিটিঙে ২০২৬-এর নির্বাচনের স্ট্র্যাটেজি ঠিক হবে। তবে আগামী কয়েক মাস শুদ্ধিকরণের নামে চলবে ভেতরকার মেরামতি।

—বিশ্বপ্রিয় দাস, কলকাতা।

বাংলাদেশ প্রশাসন কি হয়ে উঠছে পশ্চিমবঙ্গের শাসকের আদর্শ ছাত্র?

হিন্দুসমাজের উপর বিগত কয়েক দশক ধরে ভয়াবহ নির্যাতনের পরিণামে বাংলাদেশ প্রায় হিন্দুশূন্য হতে চলেছে। বিশেষত, গত ৫ আগস্টের পর থেকে বাংলাদেশ প্রশাসন পুরোপুরি জেহাদিদের হাতে চলে যাওয়ায় হিন্দু নির্যাতন এক চরম আকার ধারণ করেছে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর সবরকমের শোষণ ও নির্যাতনের ফলে বহু হিন্দু সেদেশ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। এরই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মুসলমান সীমান্ত পেরিয়ে লাগাতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে চলেছে ভারতে। এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর দল পশ্চিমবঙ্গের সেকুলার শাসক দলগুলির (বামফ্রন্ট-তৃণমূলের) নিশ্চিন্ত ভোটব্যাংক। বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দু মন্দিরগুলির উপর আক্রমণ হয়, দেবদেবীদের প্রতিমা ভেঙে ফেলা হয়, পূজামণ্ডপে অগ্নিসংযোগ করা হয়, সেই একই কায়দায় পশ্চিমবঙ্গের শীতলকুচি, ফালাকাটা, শ্যামপুর, গার্ডেনরীচে ইদানীং অনেক কিছুই ঘটে চলেছে।

সম্প্রতি দেখা গেল একটি বিপরীত চিত্র। ৫ আগস্ট পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাদেশ প্রশাসনও পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতাসীন সরকার বা শাসক দলের দ্বারা অনুপ্রাণিত কিনা সেই নিয়ে উঠেছে গুরুতর প্রশ্ন। ইউনুস দিন দিন যেন হয়ে উঠছেন পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের সুপ্রিমোর আদর্শ ছাত্র! গত ৯ আগস্ট রাতে কলকাতার আরজি কর হাসপাতালের ডাক্তার ছাত্রী অভয়া হত্যাকাণ্ডের সময় হাসপাতালের ভিতর সিসিটিভিগুলি ছিল অকেজো বা নিষ্ক্রিয়। সেই রাতের সিসিটিভি ফুটেজ অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ— একথা জানিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। হত্যাকাণ্ডের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল খারাপ সিসিটিভি ক্যামেরা। সেই কারণে তদন্তে নেমে সিবিআইও প্রাথমিকভাবে কিছুটা সমস্যায় পড়ে। গত ৫ নভেম্বর চট্টগ্রামের হাজারি গলিতে হিন্দুদের উপর নির্বিচারে গুলি চালনার পর, হিন্দুদের বাড়ি ও দোকানগুলি লুঠ করার সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ওই এলাকার সিসিটিভিগুলি ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ। নরসংহারের প্রমাণ যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, হিন্দুদের উপর গুলি চালনার ঘটনা যাতে প্রকাশ্যে না আসে--- সেই লক্ষ্যে সবরকম চেষ্টা চালায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। পশ্চিমবঙ্গের চরিত্রহীন, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত, হিন্দুবিরোধী সরকারের থেকে নোবেলজয়ী, ভুয়ো অর্থনীতিবিদের পরিচালনাধীন জেহাদি বাংলাদেশি প্রশাসন যে বাধ্য ছাত্রের মতো অনেক কিছুই শিখে চলেছে তা আজ দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার।

—অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,
খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা।

মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সঙ্কীর্ণ কেন?

চম্পা মণ্ডল

নারীজাতি সৃষ্টির উৎস। সত্যিই তো নারীজাতি সমাজের আদর্শ, যার প্রেরণার অপেক্ষায় থাকে আগামী প্রজন্ম। এক শ্রেণীর মানুষের কাছে নারীজাতি খুব সম্মানের। তাঁরা নারীজাতিকে মা বলে মনে করেন। বাসে, ট্রেনে, রাস্তায় সব জায়গায় তাঁরা নারীর সম্মান বজায় রাখার চেষ্টা করেন এবং সম্মান প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এ দৃশ্য আজ ক্রমেই বিরল হয়ে পড়ছে।

আর এক শ্রেণীর মানুষ নারীকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। নারীকে এরা প্রসাধনী সামগ্রী বলে মনে করেন। যেমন বর্তমানে বিজ্ঞাপনে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের নানাভাবে দেখানো হচ্ছে। কখনো কখনো শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে নারীশরীর প্রদর্শনের খেলাও চলছে। এমনও পরিবার আছে যাঁরা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নিজেদের মেয়েকে অন্ধকার জগতে নামিয়ে দিতেও দ্বিধা করেন না। পরে সে সুস্থ জীবনে ফিরতে চাইলেও সমাজ তাকে স্বীকার করে না। সে দীনহীনার পাত্রী হয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

অথচ নারী-পুরুষ দুই মিলেই পরিবার গড়ে তোলে। সমাজের বিভিন্ন কাজ নারীর সহযোগিতায় সহজ হয়ে উঠেছে। মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় শিক্ষিকারাই পরিচালনা করছেন। আবার মহিলা মহাবিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকা মিলে পরিচালনা করছেন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সবখানেই নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা নিতে গিয়েও শিশুকন্যারা নির্যাতিতা হচ্ছে। বিদ্যালয়ে, মহাবিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়েও তারা নির্যাতিতা হচ্ছে। আজ এই সমাজে কোনো মেয়েই সুরক্ষিত নয়। এমনকী এই মনুষ্যজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না বৃদ্ধারাও। এ আমাদের জাতির কলঙ্ক। আমরা এ কোন সমাজে বাস করছি? যেখানে নিজের পরিচয় দেওয়া লজ্জার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কুলে-কলেজে-রাস্তাঘাটে কোথাও মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। মহিলারা কোনো প্রতিবাদ করলেও তাদের নির্যাতিত হতে হয়। মেয়েরা নিজের বাড়িতেও সুরক্ষিত নয়, কারণ পর্যাপ্ত বয়স না হতেই বা সম্পর্ক সম্বন্ধে কোনো ধারণা না জন্মাতেই বা নিজেকে উপযোগী করে না তুলতেই বিয়ে

দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বে প্রতি ৩ জন বালিকাবধূর একজন ভারতের। শুধু তাই নয়, বাল্যবিবাহের নিরিখে ভারতের স্থান পৃথিবীতে ষষ্ঠ। ১৫ বছরের আগেই ২৭ শতাংশ মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ৩১ শতাংশ বিয়ে হয় ১৮ বছর হওয়ার আগে।

আমাদের সমাজের নজর মেয়েদের প্রতি খুব সঙ্কীর্ণ। এখনো মেয়েদের দায় ও বোঝাস্বরূপ মনে করা হয়। পরিবারের লোকজন দায় ও বোঝা থেকে খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চায়। এরকম মনোভাবের বিরোধিতা যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু সেটা কি, সমাজের মনের কথা? না শুধু প্রবন্ধ লেখা বা আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য? ইউনিসেফের রিপোর্টে জানা যাচ্ছে আগামী ৫০ বছরেও ভারত বাল্যবিবাহ থেকে মুক্তি পাবে না। মানসিক ও শারীরিক পরিপূর্ণতার আগে মেয়েরা স্ত্রী ও মা হওয়ার যোগ্য হয় না, তবু এই অভিশাপ তারা বয়ে বেড়াচ্ছে।

দূরদূরান্তের গ্রামে তো বটেই আজকাল ছোটো-বড়ো শহরেও বেশিরভাগ পরিবারেই কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বাড়ছে বই কমছে না। সবচাইতে আশ্চর্যের কথা, যে মায়েদের কিছু বোঝার আগেই কম বয়সে বিয়ে হয়েছে, তারাও তাঁদের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিতে উৎসাহী। সমাজতত্ত্ববিদ ও মনস্তত্ত্ববিদরা এর কারণ অনুসন্ধান করলে ভালো হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে মানতে হবে যে, অশিক্ষার মতো সামাজিক চাপ ও নিরাপত্তার অভাব এর একটা বড়ো কারণ।

আর একটা বিষয়, শিক্ষিত যুবকরা শিক্ষার গুরুত্ব অনেক সময় ভুলে যান। তাঁরা শিক্ষিত হবার পর নিজেদের নৈতিক কর্তব্যবোধ ভুলে যান। তাই তো মেয়েদেরকে পণপ্রথার শিকার হতে হয়। বিবাহ একটা নৈতিক কর্তব্য এবং সেটাও তাঁরা অর্থের বিনিময়ে করে থাকেন। কখনও এই বিনিময় অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। যেমন বাড়ি-গাড়ি বা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। হয়তো-বা সেই জন্যই কন্যাসন্তানকে ছোটো চোখে দেখা হয়। ফলস্বরূপ ভারতে পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত উদ্বেগজনকভাবে কমছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৮২ সালে ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৬২ জন। তারপর তিন দশকে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কন্যাভ্রূণ হত্যা হয়েছে। যার ফলে ২০১১ সালে ১০০০ জন পুরুষে নারীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১৮ জন। আজ আমরা যে সমাজে বসবাস করছি সেখানে নারীরা কতভাবে অত্যাচারিত হচ্ছেন। কখনও শারীরিকভাবে, কখনও মানসিকভাবে। পুরুষদের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটানো দরকার। নারীকে শুধু একটা মেয়ে না ভেবে একজন মানুষ অথবা মা হিসেবে ভেবে দেখুন। মা মমতার ভাণ্ডার, মা আমাদের জন্য কিনা করতে পারেন। মা'র সঙ্গে কি কখনও খারাপ ব্যবহার করা যায়? মেয়েদের নিজের মা, নিজের বোন, নিজের দিদি ভাবলে কুপ্রবৃত্তির উদয় হবে না।

সবচেয়ে বড়ো কথা, মেয়েদের আজ প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে হবে।

শরীর উপবাস চায়

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

যে কোনও পূজার্চনা মানেই নিষ্ঠাভরে প্রার্থনা। আর এই প্রার্থনার শর্তই হলো, নির্জলা উপোস। কিংবা যদিও বা জল গিলে খাওয়া যেতে পারে কিন্তু দাঁতে কাটা যাবে না কিছু। ভগবানের ক্ষুধা ও তৃষ্ণারূপ অনুভব করতে গেলে না খেয়ে থাকাই উচিত, এই মত মেনেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপবাসের রীতি প্রচলিত।

এখন এই নিয়মে শরীর কতটা অভ্যস্ত বা শরীর কতটা সহ্য করতে পারে সেটাও কিন্তু পরোক্ষভাবে বোঝা জরুরি। শরীরের জন্য উপোস ভালো না খারাপ তা নিয়ে নানা মত আছে। তবে, যদি ঠিক মতো বুঝে উপোস করা হয়, তাহলে এর ইতিবাচক প্রভাব শরীরে পড়ে। আবার অতিরিক্ত করলে ক্ষতিও হয়।

ভালো দিক কী?

● মাঝেমধ্যে উপোস করলে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হয়। ইনুলিন রেজিস্ট্যান্স কমায়।

● এই উপবাস শরীরের ইমিউন সিস্টেম বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে।

● ট্রাইগ্লিসারাইড, কোলেস্টরল এই সব কমিয়ে হার্টের অসুখ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

● কিছু প্রাণীর শরীরে পরীক্ষা করে তথ্য মিলেছে, ওয়ার্কিং মেমরি বা ভার্বাল মেমরি উপবাসের পর বেড়ে যায়। অর্থাৎ স্মৃতিশক্তিতেও এই ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। যা মানব শরীরেও সমভাবে কাজ করবে বলেই অনুমান করা যায়।

● উপোস করলে গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ বাড়ে। এছাড়াও পেটে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া রয়েছে যেমন, ক্রাইস্টিনসেনেলা। যা উপবাস করলে শরীরে বা পেটে জন্মায়। এই ব্যাকটিরিয়া একজনের আয়ু বাড়াতে সাহায্য করে। তাই বলা হয় যাঁরা মাঝেমধ্যে উপোস করেন তাঁদের দীর্ঘায়ু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

● এছাড়াও উপবাস করলে ওজন বা মেদ কমে, ভুঁড়ি কমে। যা অনেক অসুখ প্রতিহত করে।

● ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে, শরীর থেকে টক্সিন বেরিয়ে যায়।

তবে কী ধরনের উপবাস করছেন তার উপর নির্ভর করবে শরীরের খারাপ ভালো।

ধরন আছে অনেক, কোনটা ভালো

ফস্টিং বা উপোস কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে।

ওয়াটার ফাস্টিং : অনেকে সারাদিন শুধু জল খেয়ে উপবাস করেন।

জ্যুস ফাস্টিং : শুধুমাত্র ফলের রস খেয়ে থাকা।

টোট্যাল ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন : এক্ষেত্রে সারাদিনই খাওয়া চলে, কিন্তু খুবই নিয়ন্ত্রিত পরিমাণে আহার গ্রহণ করতে হবে।

ফ্যাটিলিভার কমাচ্ছে উপবাস

ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং : সাধারণত পূজা-পার্বণে আমরা যে ধরনের উপোস করি সেটা এই ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং-ই। এই উপবাস বর্তমানে শরীরের জন্য সবচেয়ে ভালো। এক্ষেত্রে ১২-১৪ ঘণ্টা উপোস করে থাকার পর তার পরের বাকি সময়ে খাবার খাওয়া হয়। অর্থাৎ অনেকক্ষণ না খেয়ে থেকে তারপর খাবার খাওয়ার এই পন্থাকেই বলা হয় ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং।

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ফ্যাটিলিভার প্রতিহত করতে এই ফাস্টিং দারুণ কার্যকর। এই উপবাসে সাধারণত সারাদিনে দুটো মিল খাওয়া যেতে পারে। হতে পারে সারাদিন না খেয়ে তারপর দুপুরে খাবার খেলেন ও রাতে অল্প। অথবা সকালে পেট ভর্তি করে খেয়ে দুপুরে খুব হালকা ফল বা জ্যুস, হার্বাল টি খেয়ে থাকা। তারপর সন্ধে ৭-৮টার মধ্যে রাতের ডিনার করে নেওয়া দরকার। এই ফাস্টিং করলে লিভারের ভিতরে যে ফ্যাট জমে সেটা ঝরিয়ে ফেলা সম্ভব। সাধারণত ওষুধের দ্বারা যা করা সম্ভব নয়।

উপবাস ভাঙার পর আহার

দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকার পর হঠাৎ বেশি খেয়ে ফেললে শরীরে ক্ষতিকর প্রভাব পরে। এক্ষেত্রে প্রথমেই শরবত, মিষ্টি অর্থাৎ ক্যালোরিযুক্ত খাবার খেলে ভালো। এগুলো অল্প পরিমাণে কিন্তু উপযুক্ত ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার। এতে শরীরে এনার্জির অভাব দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া যায়। ফল, বাদাম, ছোলা, খেজুর ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে।

ফাস্টিং ভাঙার পর অনেকটা পরিমাণে খেলে সেক্ষেত্রে তার কুপ্রভাব পড়তে পারে শরীরে। তাই ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার অল্প পরিমাণে খেতে হবে। বিশেষ করে উপোস করার আগে বা পরে, সমস্ত রকম প্রসেসড ফুড, জাঙ্ক ফুড এবং ঘরে তৈরি অধিক ভাজাভুজি খাবার থেকেও দূরে থাকুন।

কাদের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর

সাধারণত যাঁদের ডায়াবেটিস রয়েছে বা ইনসুলিন নেন তাঁহার ক্ষতিকর সম্ভাবনা বেশি। দীর্ঘ সময় না খেয়ে থাকলে শরীরে ইনসুলিন ক্ষরিত হবে না। তার পর যেই শরীরে খাবার ঢুকবে, ব্লাড সুগার লেভেল হঠাৎ অনেকটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। শুধু ব্লাড সুগার নয়, স্টমাক আলসার, গ্যাসট্রাইটিস কিংবা হায়াটাস হার্নিয়া থাকলে উপোস তাঁর পক্ষে অবশ্যই ক্ষতিকর।

ক্যানসার রোগীদেরও উপবাস থেকে বিরত থাকা দরকার। তবে উপবাস করলে নির্জলা না করাই ভালো। কিছু না খেলেও জলটা খেতে হবে। তা না হলে শরীরে বিশেষত কোষে জলের অভাবে নানা সমস্যা শুরু হয়। সোডিয়াম-পটাশিয়ামের অভাব দেখা দিতে পারে। উপবাসের খারাপ প্রভাব শুরু হয় শরীর জুড়ে। □

বঙ্গের অঙ্গনে গুরুনানকদেব

সোমকান্তি দাস

বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িতে গল্পের আসর বসেছে ১৮৮৩ সালের ৭ এপ্রিল, শনিবার। মধ্যমণি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব। নরেনও সেখানে উপস্থিত। গল্পের মাঝে ঠাকুর নরেনকে গান গাইতে বলেন। সেদিন নরেন পাঁচটি গান করেন। চতুর্থ গানটি ছিল, 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে।'

১৮৭৩ সালে উপনয়নের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ভ্রমণে আসেন, সেখানে গুরু নানকদেবের রচিত একটি ভজন চলছিল, 'গগন মে থালু রবি চন্দু দীপক।' মনে গেঁথে গেল সেই সুর ও শব্দ। ১৮৭৫ মাঘোৎসব কালে তাঁরই অনুবাদ করা গানটি গাওয়া হয় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে। এইটিই রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম গান। যদিও ব্রাহ্মসমাজের প্রকাশিত 'ব্রহ্মসংগীত স্বরলিপি' গ্রন্থে এটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ব্রাহ্ম সমাজের পাক্ষিক মুখপত্র 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার ১ ভাদ্র ১২৭৯ (ইং ১৮৭২) সংখ্যাতে নানকদেবের ভজনটি বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত হয়। আবার 'তত্ত্ববোধিনী'-র ফাল্গুন সংখ্যাতে এর গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তীকালেই পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অমৃতসর ভ্রমণ। তাই এই পূর্বপরিচিত ভজনটি শোনার পর তিনি তার কাব্যিক অনুবাদ করেন।

চলচ্চিত্রশিল্পী বলরাজ সাহনি তখন শান্তিনিকেতনে ইংরেজি ও হিন্দির শিক্ষক। তিনি ভারতের প্রার্থনা সংগীতের মতো বিশ্ব প্রার্থনা সংগীত রচনার আগ্রহ প্রকাশ করেন কবিগুরুর কাছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, বিশ্ব প্রার্থনা তো বহু আগে থেকেই রয়েছে। তা কেবলমাত্র বিশ্ব প্রার্থনা নয় বরং ব্রহ্মাণ্ড প্রার্থনা। এটি লিখে গিয়েছেন গুরু নানকদেব। আর তার অনুবাদও তিনি করেছেন।

নানকদেব পূর্বভারতের কামরূপ কামাখ্যা, বঙ্গ প্রদেশ, উৎকল ভ্রমণ করেন। সম্ভবত ১৫০৬ সাল নাগাদ পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বসেই গুরুমুখী ভাষায় একটি ভজন পরিবেশন করেন। যার মধ্যে ছিল বিশ্বজনীন প্রার্থনার সুর।

গুরুনানকদেবের রচনা এবং রবীন্দ্রনাথ অনূদিত গানটি ব্রহ্মসংগীত হিসেবে পরিচিত। গীতবিতানের পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়ে গানটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।।
কেমন আরতি, হে ভবখণ্ডন, তব
আরতি—
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।।

গুরু তেগ বাহাদুরের বলিদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে

রাজদীপ মিশ্র

শিখপন্থের গোড়াপত্তনকারী দশজন শিখগুরুর মধ্যে নবম গুরু হলেন গুরু তেগবাহাদুর। পারিবারিক নাম ত্যাগমল। ১৬৬৫ সালের ২০ মার্চ থেকে ১৬৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর তাঁর শিরশ্ছেদের আগে অবধি তিনি শিখদের নেতৃত্ব দেন। ১৬২১ সালের ১ এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে তাঁর জন্ম। বাবা গুরু হরগোবিন্দ এবং মা নানকি। তেগবাহাদুরের স্ত্রী ছিলেন মাতা গুজরি এবং সুতো সন্তান ছিলেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। তেগবাহাদুর ছিলেন একজন অকুতোভয় এবং সম্মুখসারির যোদ্ধা। এছাড়াও তিনি ছিলেন প্রোথিতযশা ধর্মপণ্ডিত এবং কবি। তাঁর ১১৫টি স্তোত্র শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ গুরুগ্রন্থসাহিবে সংকলিত হয়েছে। তীরন্দাজ ও ঘোড়সওয়ারীতে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে কর্তারপুরের যুদ্ধে মাত্র ১৪ বছর বয়সী ত্যাগমল বিপুল বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তা দেখে পিতা হরগোবিন্দ পারিবারিক নাম ত্যাগমল থেকে নতুন নামকরণ করেন তেগবাহাদুর, যার অর্থ সাহসী তলোয়ার।

গুরু তেগবাহাদুর প্রথম শিখগুরু যিনি গুরু নানকের শিক্ষা প্রচারের জন্য ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং ঢাকা ও অসম-সহ ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শিখ পন্থের প্রচারও করেন। তিনি যে সমস্ত স্থান পরিদর্শন করেছিলেন এবং অবস্থান করেছিলেন সেগুলি শিখ মন্দিরের স্থান হয়ে উঠেছে। ভ্রমণের সময় তিনি বেশ কিছু জলের কূপ এবং লঙ্গর (দরিদ্রদের জন্য কমিউনিটি রান্নাঘর) চালু করেছিলেন। তিনি আনন্দপুর সাহিব শহর তৈরি করেন।

কাশ্মীর থেকে হিন্দু পণ্ডিতদের একটি দল ঔরঙ্গজেবের নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে তেগবাহাদুরকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছিল এবং গুরু তেগবাহাদুর তাদের অধিকার রক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুঘল প্রশাসনের নিয়মিত পর্যবেক্ষণে থাকার জন্য তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মুঘল শাসকদের দ্বারা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের নিপীড়নের মোকাবিলা করার জন্য মাখোয়ালে তাঁর ঘাঁটি থেকে তিনি চলে যান। কিন্তু রোপারে গ্রেপ্তার হন এবং সিরহিন্দে কারাবন্দি হন। সঙ্গে তাঁর তিন সঙ্গী দেওয়ান মতি দাস, সতী দাস এবং দয়াল দাসকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সিরহিন্দে চারমাস কারাবাসের সময় তাদেরকে ইসলামি মজহব গ্রহণে প্ররোচিত করা হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে তাদের লোহার খাঁচাতে করে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঔরঙ্গজেবের সামনে হাজির করানো হয় তিনি গুরু তেগবাহাদুরকে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি করাতে ব্যর্থ হন। ফলস্বরূপ ভাই মতি দাসকে করাত দিয়ে দু'খণ্ড করা হয়। ভাই দয়াল দাসকে ফুটন্ত তরল একটি কড়াইতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং ভাই সতী দাসকে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল। তারপর ১১ নভেম্বর তেগবাহাদুরকে লালকেল্লার নিকটবর্তী বাজার চত্বরে চাঁদনী চকে প্রকাশ্যে শিরশ্ছেদ করা হয়।

মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব কর্তৃক গুরু তেগবাহাদুরের মৃত্যুদণ্ডের পর, তাঁর এবং তাঁর সহযোগীদের স্মৃতিতে বেশ কয়েকটি গুরুদ্বারা নির্মিত হয়েছিল যা দিল্লির চাঁদনীচকের গুরুদ্বার শীশগঞ্জ সাহিব নামে পরিচিত। যে স্থানে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়েছিল গুরুদ্বারাগুলি তার উপরেই নির্মিত। গুরু তেগবাহাদুরের মৃতদেহ দাহ করার অপরাধে তাঁর এক শিষ্যের বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লি সেই স্থানে গড়ে উঠেছে গুরুদ্বারা রাকাবগঞ্জ সাহিব।

এইসব ঘটনা এতদিন পরেও আমাদের দুটি জিনিস স্মরণ করায়— মুঘল বাদশাদের অকথ্য অত্যাচার এবং ধর্মরক্ষার জন্য শিখগুরু তথা শিষ্যদের বলিদান। গুরু তেগবাহাদুরের ঐতিহাসিক আত্মবলিদান স্মরণে শিখ মতাবলম্বীরা বলে থাকেন— 'গুরু শীশ দিয়া পর সার নহি দিয়া'। অর্থাৎ গুরু তাঁর মস্তক দান করলেন, কিন্তু ধর্ম পরিত্যাগ করলেন না। □

হিন্দু-শিখ সহাবস্থান : গুরু নানক এবং শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ও
ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

শিখপন্থ কী হিন্দুধর্মেরই একটি শাখা?

ঠাকুরের গৃহীভক্ত রামচন্দ্র দত্ত রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত' (১২৯৭) গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঠাকুর শিখমতে দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং অন্যান্য সাধনার মতো এই সাধনাতেও তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই উৎসাহ ও সাধনার ধারা এসেছিল ইসলাম সাধনার আগে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগ্নে হৃদয়রাম সূত্রে জানা যায়, তাঁর নির্দেশে একজন শিখ সেপাই প্রতিদিন তাঁকে গুরু নানকের উপদেশ শোনাতেন। জানা যায়, ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেনেরও আগে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা উপলব্ধি করেছিলেন বহু শিখ ভক্ত সেপাই এবং কয়েকজন ঊর্ধ্বতন সৈনিক। তাঁরাই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচারে আনলেন। এদেরই অন্যতম ছিলেন শিখ হাবিলদার তথা তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানুষ কুঁয়োর সিংহ। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে নানক জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন।

শিখ ভক্তদের এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে বারাকপুর (চানক) ও দমদমের সেনা ব্যারাকে এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও উদ্যানের ঠিক উত্তর দিকে ইংরেজ সরকারের বারুদখানা বা ম্যাগাজিনের পাহারাদার শিখদের মধ্যে। কলকাতার শিখ সম্প্রদায় তারপর বড়বাজারের মাড়োয়ারি ভক্তদের মাঝেও ছড়িয়ে দিলেন পরমহংসদেবের মহিমার কথা, এমনটাই লিখেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী। এরপর অন্যান্য ভক্তগোষ্ঠী তাঁর আকর্ষণে মধুকরের মতো এলেন সামীপ্যে- সন্নিধ্যে। সিদ্ধ, সাধু ও সাধকদের আগমন ঘটল দক্ষিণেশ্বরে।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন প্রয়াত সহ-সভাপতি স্বামী প্রভানন্দজী লিখছেন, 'সে সময়ে হিন্দুরা বিশ্বাস করত যে, শিখধর্ম হিন্দুধর্মের একটি শাখা।' কোন সময়? শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তখন দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করছেন। প্রভানন্দজীর লেখা থেকে জানা যায়, কৌতূহলী শ্রীরামকৃষ্ণ খুব সম্ভবত কলকাতার প্রাচীনতম গুরুদ্বারা বড় শিখসঙ্গতে পদার্পণ করেছিলেন। এই স্থানটি শিখদের কাছে খুবই পবিত্র, কারণ গুরু নানক পুরী যাবার পথে এখানেই অবস্থান করেছিলেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনের তৃতীয় দিনে সাধারণ জনসভায় সভাপতি তথা শ্রীরামকৃষ্ণ পার্ষদ স্বামী অখণ্ডানন্দজী বললেন,

'রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রমুখের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দুধর্ম বিভিন্ন সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছিল।' আরও বলেন, 'আচার্য শঙ্কর একদা পতনোন্মুখ হিন্দুধর্মকে পুনর্গঠন করিয়া বৈদিক সত্যগুলিকে একদিকে বৌদ্ধ নাস্তিকতা ও অধঃপতনরূপ সিলা (Scylla) এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য কর্মকাণ্ড ও নিষ্ফল বাদানুবাদরূপ ক্যারিবডিস (Charybdis) হইতে উদ্ধার করেন।' এই বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে, তাঁরা শিখপন্থ ও বৌদ্ধমতকে বৃহত্তর হিন্দুধর্মের মধ্যেই গণ্য করেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে গুরু নানকের মতোই শ্রদ্ধা করতেন শিখপন্থীরা তা উল্লেখ আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' গ্রন্থে কাব্যিক ভাষায়। প্রথম, ফিটন গাড়িতে যাত্রী হিসেবে সপার্ষদ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে এক ব্যাটেলিয়ান শিখসৈন্য পথের মাঝেই একবার এমন উচ্ছ্বাস ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন যে, তার জন্য ব্রিটিশ ক্যাপ্টেন তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করে। দ্বিতীয়, কেবলমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ছাড়া আর কারও কথাই শুনবে না বলে শিখ সেপাইরাই একবার প্রবল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

১. 'দরশন করি তাঁয় যতেক সেনানী।
জয়গুরু সম্ভাষিয়া লুটায় অবনী।।
ফেলিয়া বন্দুক শস্ত্র ধরা করতলে।
সামরিক রীতি প্রথা একেবারে ঠেলে।।'

এই ঘটনাটি ঘটে যেদিন রাসমণির জামাই মথুরমোহন বিশ্বাস এবং ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়রাম একটি ফিটন গাড়ি চড়ে আসছিলেন। উলটোদিকে এক ব্যাটেলিয়ান শিখসৈন্য মার্চ করে চলছিল বারাকপুর ছাউনি থেকে ভুটানের উদ্দেশ্যে। ঠাকুরকে গাড়িতে দেখেই উল্লসিত হয়ে ওঠে শিখসেনারা। তাতে ঠাকুর ভাবস্থ হলেন; পরে ভাব সংবরণ করে হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ভক্ত সেনাদের। ইংরেজ ক্যাপ্টেন এই নিয়ম লঙ্ঘনে রুষ্ট হয়ে কৈফিয়ত

তলব করলে, সেনাদের স্পষ্ট জবাব ছিল,

'নাহি করি কোন গ্রাহ্য যায় যাক প্রাণ।
দেখিলে করিব আগে গুরুরে প্রণাম।।'

২. 'শাস্ত্রীরে কহিল তুমি আসক্ত সংসারী।
জ্ঞান কথা উপদেশ নহ অধিকারী।।
শাস্ত্র ঠেলি কি কারণ কহ হেন কথা।
শাস্ত্রের অমান্য দোষে লব আজি মাথা।।'

এই শাস্ত্রী হচ্ছেন রাজস্থান জয়পুরের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী। তাঁকে নিয়ে একদিন দক্ষিণেশ্বরের বারুদ কারখানায় গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঠাকুরকে দেখে আভূমি প্রণাম করলেন শিখ সেপাইরা। সকলে ঘিরে ধরলেন তাঁর অমৃতবচন শুনবেন। ঠাকুর কথা বলছেন, এরই মধ্যে শাস্ত্রী কিছু একটা ব্যাখ্যা দিতে উঠলে বিপত্তি বাঁধলো, 'ক্যায়া গৃহী হোকে জ্ঞান বতাতা?' কৃপাণ নিয়ে ছুটে আসে সেপাইরা, শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্কিত, সেপাইদের শান্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন, 'আমার দিকে চেয়ে একে ক্ষমা কর।' শান্ত হয়ে সেপাইরা বললো, 'গৃহী হোকে ইয়ে চাল বড়া বুরা হ্যায়। মগর তুম অ্যায়সা কাম আউর মৎ করো।'

অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে শিখ সাধুর সম্পর্ক

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্জাব প্রদেশে উদাসী ও নির্মল সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদের বিশেষভাবে দেখা যায়। খালসা শিখসাধুরা 'নির্মল' নামে পরিচিত। গুরু নানক থেকে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত সকলকেই তাঁরা আচার্য বলে মানেন। 'উদাসী'রা হলেন গুরুনানকের সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বামী অখণ্ডানন্দজী হিমালয় ভ্রমণ পর্বে কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশীতে পূর্বপরিচিত এক উদাসী সাধুর সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করেছিলেন, যিনি উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন। অখণ্ডানন্দজী এই উদাসী সাধুকে পরম মমতায় নিজের মোটা কম্বলখানি তাঁর কাঁধে তুলে দিয়ে তাঁর পাতলা কম্বলটি চেয়ে নিলেন। এটি নিয়েই তিনি এক বছর পর্বতভ্রমণ করেছিলেন। উদাসী সাধুর প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের আন্তরিকতার বিবরণ আছে অখণ্ডানন্দজীর 'তিব্বতের পথে হিমালয়' গ্রন্থে, 'আমার সহযাত্রী মহাপুরুষেরও শীত-নিবারণোপযোগী বস্ত্রের অভাব দেখিলাম। তাঁহার মাথায় সামান্য একটা কাপড়ের পাগড়ি, গায়ে একটা ছেঁড়া পিরান এবং নিতান্তই জ্যালজেলে ছেঁড়া একখানা কম্বলমাত্র ছিল। তাঁহার আর কিছুই ছিল না, পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে তো দুইজনই সমান। এদিকে আমরা যতই উপরে উঠিতে লাগলাম, শীতের প্রাবল্য ততই বোধ হইতে লাগিল। আমার গায়ে একটা কম্বলের আলখাল্লা ছিল। তাঁহার কিন্তু উর্ণাবস্ত্রের মধ্যে সেই একখানি ছেঁড়া কম্বল ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। সুতরাং আমার ওখিমঠ হইতে আনীত কম্বলখানি তাঁহাকে দিয়া আমি তাঁহার ছেঁড়া কম্বলখানি লইলাম। আমার ভালো কম্বলখানি তাঁহাকে দেওয়ায় তাঁহার শীতবস্ত্রের অভাব কতক দূর হইল।'

কলকাতার নিকটবর্তী কাশীপুরে সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পূর্ব উল্লিখিত উদাসী সাধুর সঙ্গে স্বামী অখণ্ডানন্দের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই সাধুর সঙ্গে একমাস তিনি বর্ধমানে অবস্থান করেন এবং তাঁর নির্জন-সেবার পরিচয় পান। সাধুটি লোকালয় ছেড়ে অতি নিভৃতস্থানে একাকী থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন ফলাহারী। সাধু-জমাৎ বা লোকসমাগম আছে, এরকম জায়গায় উপাসনার আসন তিনি পাততেন না। তাঁর কথাবার্তা মধুর ছিল এবং আচার-আচরণও ছিল একজন প্রকৃত সাধুর অনুরূপ, তাই স্বামী অখণ্ডানন্দজী যখন কেদারনাথের পথে গুপ্তকাশীতে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর দর্শন পেলেন, তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। একরাত্রি গুপ্তকাশীতে থেকে পরদিন সকালে দু'জনে কেদারের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। রাত্রিতে প্রায়ই এক চটিতে থাকতেন তাঁরা। অখণ্ডানন্দজী লিখছেন, গুপ্তকাশী থেকে কয়েক ক্রোশ উপরে তাঁরা ফাটাচটিতে পৌঁছালে ওই চটির বাঙ্গালি সন্ন্যাসী তাঁদের জন্য উপযুক্ত আহারের বন্দোবস্ত করালেন। অখণ্ডানন্দজী ভিক্ষা পেলেন; উদাসী সাধুটিও পেলেন ফলাহার। আর দু'জনেই পেলেন অতি উত্তম এবং সুঘ্রাণযুক্ত একপ্রকার পাহাড়ি মধু। এই চটির সাধু পূর্বে কৈলাস ও মানস সরোবরে গেছিলেন, তাঁর কাছে পথের সন্ধান জানার উদ্দেশ্যেই অখণ্ডানন্দজী তাঁর কাছে এসেছিলেন।

নিবেদিতা ও স্বামীজীর শিখপন্থা সম্পর্কে অনুভব :

১৯০৩ সাল, ভগিনী নিবেদিতা মেদিনীপুর গেছেন। স্বাধীনতাপ্রেমী যুবকেরা উৎফুল্ল হয়ে জয়ধ্বনি দিলেন, 'হিপ্ হিপ্ হুররে।' নিবেদিতার পছন্দ হলো না তা, কারণ এটি ইংরেজ জাতির বিজয়োল্লাস, তা কেন ব্যবহার করবেন ভারতবাসী? হাত তুলে উঁচুস্বরে তিনবার বললেন, 'ওয়াহে গুরুজী কী ফতে। বোল্ বাবুজী কী খালসা।' যে ধ্বনি একদা মোগল-শিখের রণে দিকমণ্ডল কাঁপিয়ে তুলতো, তাই তিনি উচ্চারণ করলেন; গুরুদেবের জয়, তাঁরই কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। এই ছিল নিবেদিতার শিখপন্থ সম্পর্কে অনুভব।

স্বামী বিবেকানন্দের শিখপন্থ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর লাহোর বক্তৃতার (১৮৯৭) মধ্যে রয়েছে। তিনি এই বক্তৃতায় লাহোরকে 'বীরভূমি' ও 'পবিত্রভূমি' বলে প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'আমাদের মধ্যে কী কী বিভিন্নতা আছে, তা প্রকাশ করার জন্য আমি এখানে আসিনি। এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তা অন্বেষণ করতে। কোন ভিত্তি অবলম্বন করে আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি। কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে যে বাণী অনন্তকাল ধরে আমাদের আশার কথা শুনিয়ে আসছে, তা প্রবল থেকে প্রবলতর হতে পারে, তা বোঝার চেষ্টা করতে আমি এখানে এসেছি।' স্বামীজী গুরু নানক এবং গুরুগোবিন্দ সিংহের মহত্ত্ব উত্থাপন করেছিলেন এবং হিন্দুধর্ম ও শিখপন্থের একত্ব ও মিলনের সূত্র নিয়ে কথা বললেন। সেই বিখ্যাত প্রাচীন ভারতীয় ঘোষণাটি পুনর্বার করলেন, 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।'

শিখপন্থায় শিক্ষা হলো একেশ্বরে ; গুরু ও নামজপে। শিখপন্থায় মূর্তিপূজার স্থান নেই, তার নির্যাস হিন্দুধর্মের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায়ও রয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সবকিছুর অস্তিত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থে শিখ সম্প্রদায়ের দশজন গুরু সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব অনুভব জানিয়ে বলেছেন তাঁরা সকলে জনক ঋষির অবতার। 'রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশগুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখ জাতির মধ্যে ধর্মস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন।' শিখদের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনেছিলেন এবং মন্তব্য করেছিলেন, শিখদের এই কথা মিথ্যা হবার কোনো কারণ নেই। শিখদের সঙ্গে তাঁর এই ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে তাঁদের হৃদয়ে শ্রীনানক জ্ঞানেই তাঁর চির আসন পাতা।

তথ্যসূত্র :

১. শিখদের সাথী শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী প্রভানন্দ, গ্রন্থ : অমৃতময় শ্রীরামকৃষ্ণ, উদ্বোধন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ ১১তম পুনর্মুদ্রণ ২০২৩, পৃষ্ঠা : ৬৩-৭৩।

২. স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গীতে শিখ সম্প্রদায় হিন্দুধর্মেরই উত্তরাধিকারী, কল্যাণ গৌতম, স্বস্তিকা, ৭৬(১০), ২৭ নভেম্বর, ২০২৩, পৃষ্ঠা : ২৫-২৭।

৩. স্বামী অখণ্ডানন্দের রচনা সংকলন, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সারগাছি, মুর্শিদাবাদ, ১৪২৪, পৃষ্ঠা : ৯, ৭০-৭১, ১০৩।

ডাকটিকিটে শিখ সম্প্রদায়

সৈকত চট্টোপাধ্যায়

'ওয়াহে গুরুজী কা খালসা, ওয়াহে গুরুজী কি ফতেহ্'

খালসা ঈশ্বরের এবং বিজয় ঈশ্বরের— এই বিশ্বাসের উপর গুরু নানকের দ্বারা পঞ্চদশ শতকে পঞ্জাব প্রদেশ থেকে শুরু হওয়া একটি পন্থ আবির্ভাবের পরবর্তী পর্যায়ে আরও ন'জন গুরু উত্তরাধিকারী হন। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে গুরু গ্রন্থ সাহিবকেই গুরুস্থলে অভিসিক্ত করেন। দেশপ্রেম, সেবা এবং বিধর্মী মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রসিদ্ধ শিখদের সম্মানার্থে ভারতীয় ডাকবিভাগ সময়ে সময়ে বিভিন্ন ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

শিখ পন্থাবলম্বীদের উপাসনাগৃহ গুরুদ্বারাগুলি শিল্প স্থাপত্যের স্বাক্ষরবাহী। ১৯৩৫ সালে ইংরেজ শাসনে পঞ্চম জর্জ রাজত্বের রৌপ্য জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সাড়ে তিন আনা মূল্যের হরমিন্দর সাহিব (অমৃতসর স্বর্ণমন্দির) সাদাকালো ডাকটিকিটে ছাপা হয়। পঞ্চম জর্জের ছবি ডানদিকে ছিল। এটি ভারতের তাজমহল, ভিক্টোরিয়া প্যালেস-সহ ছয়টি প্রসিদ্ধ মনুমেন্ট সেটের অন্যতম টিকিটরূপে প্রকাশ পায়। ১৯৪৯ সালে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে প্রকাশিত ডাকটিকিট সমূহের মধ্যে নীল রঙে হরমিন্দর সাহিব উঠে আসে। ১৯৬৭ সালে দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের ৩০০তম জন্মজয়ন্তীতে ১৫ পয়সা মূল্যের স্ট্যাম্প ও কভার প্রকাশিত হয়।

১৯৬৯ সালে গুরু নানকদেবের আবির্ভাবের ৫০০ বছর উপলক্ষ্যে ২০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়। অধুনা পাকিস্তানের নানকানা সাহিব (নানকদেবের জন্মস্থান) গুরুদ্বারা 'বের সাহিব'-এর ছবি উঠে আসে। সেখানে নদীর তীরে গুরুনানকদেব একটি বৃক্ষরোপণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।

পাঁচ শতকেরও বেশি সময় ধরে বিনামূল্যে খাদ্য সেবায় (লঙ্গর) সমর্পিত শিখেরা। সেটিকে সম্মাননা জানিয়ে ১৯৭৯ সালে লঙ্গরের ছবি ডাকটিকিটে উঠে আসে। নবম গুরু তেগবাহাদুরের ৩০০তম বলিদান দিবসে ভারতীয় ডাকবিভাগ শ্রদ্ধা জানিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। ফার্স্ট ডে কভারে গুরুদ্বারা রাকাবগঞ্জ সাহিব উঠে আসে যেখানে গুরু তেগবাহাদুরকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৮ সালে হরমিন্দর সাহিব (স্বর্ণমন্দির) এর ৪০০তম বর্ষে ৬০ পয়সা দামের টিকিট প্রকাশিত হয়।

১৯৯৯ সালে খালসা পন্থের ত্রিশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ভারতীয় ডাকটিকিটে পরম শ্রদ্ধার কেন্দ্র— আনন্দপুর সাহিব উঠে আসে। ২০১৭ সালে গুরু গোবিন্দ সিংহের ৩৫০ বর্ষ জন্মজয়ন্তীতে তখত শ্রীহরিমন্দিরজী পাটনা সাহিবের ছবি-সহ ডাকটিকিট প্রকাশ করে ডাকবিভাগ। ভারত ছাড়াও পাকিস্তান, কানাডা-সহ বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিটে শিখ সম্প্রদায় গুরু এবং গুরুদ্বারা নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে। ভক্তি আন্দোলনের সমসাময়িক কালে উদ্ভব হওয়া শিখ সম্প্রদায় যাকে সনাতন ধর্মের অংশ বলে মনে করা হয়, তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ভবিষ্যতেও ভারতীয় ডাকের ফিলাটেলি বিভাগ থেকে অনেক নয়নাভিরাম ডাকটিকিট নিশ্চিতভাবেই প্রকাশিত হবে।

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, দক্ষিণবঙ্গের পরিচালনায় একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৫-২৭ অক্টোবর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, দক্ষিণবঙ্গের পরিচালনায় পশ্চিম পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরের রাঙ্গাডি কল্যাণ আশ্রম সংলগ্ন ময়দানে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ২৬তম প্রাদেশিক একলব্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির পদ অলংকৃত করেন স্থানীয় ইচাডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লক্ষ্মীনারায়ণ সিংসর্দার। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সেন্ট্রাল ব্যাংকের বলরামপুর শাখার ম্যানেজার রাঘবেন্দ্র শঙ্কর। প্রতিযোগিতার প্রধান বিচারক ছিলেন বুড়দা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ সিং মাহাত। উপস্থিত ছিলেন এই প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক তথা ডাভা গোপলাডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক গুরুচরণ সোরেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত, বাঘমুণ্ডি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিবারণ চন্দ্র মাইতি, পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের ক্ষেত্রীয় সংগঠন সম্পাদক বিশ্বামিত্র মহন্ত, প্রাদেশিক সংগঠন সম্পাদক উত্তম কুমার মাহাত।

এই প্রতিযোগিতায় দক্ষিণবঙ্গের ১৩টি জেলা থেকে ২০১ জন জনজাতি ক্রীড়াবিদ ভাই-বোনে তিরন্দাজি ও ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। এই প্রতিযোগিতা হলো রাষ্ট্রীয় ভাবনায় জনজাতি সমাজের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা অন্বেষণের মাধ্যমে জনজাতি ভাই-বোনেদের স্বাভিমান জাগ্রত করে উন্নত মানের ক্রীড়াবিদ নির্মাণ করা। আগামী ২৬-৩১ ডিসেম্বর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম, দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মোট ২৭ জন ক্রীড়াবিদ ভাই-বোন যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

ভাষা প্রবোধন প্রশিক্ষণ শিবির

গত ২০ থেকে ২৭ অক্টোবর হাওড়া জেলার তাঁতিবেড়িয়া সারদা শিশুমন্দির বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় সংস্কৃতভারতী দক্ষিণবঙ্গের ৭ দিনের আবাসিক সংস্কৃতভাষা প্রবোধন বর্গ। উদ্বোধন করেন কলকাতার সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তন্ময় ভট্টাচার্য এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কৌশিক প্রামাণিক। শিক্ষার্থী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা। প্রতিদিন ভোর ৫টায় জাগরণ থেকে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত চলে শিক্ষার্থীদের সংস্কৃতভাষা শিক্ষাদান। তাঁদের এই ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শুদ্ধতা আনতে বর্গের প্রশিক্ষকরা সর্বতোভাবে প্রয়াস করেন। এই বর্গের বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পূর্ণ সংস্কৃতময় বাতাবরণ। অর্থাৎ সকলকেই সর্বদা সংস্কৃতভাষায় কথা বলার অভ্যাস। সংস্কৃতভারতীর অখিল ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রমুখ রামনারায়ণ মহাদেবন এই শিবির পরিদর্শন করে সকলকে প্রতিদিন কমপক্ষে এক ঘণ্টা সংস্কৃতভাষা প্রচার ও প্রসারের জন্য আবেদন জানান। বর্গের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এই আবাসিক বর্গের প্রমুখ ছিলেন শিক্ষক মধুসূদন জানা, শিক্ষণ প্রমুখ অধ্যাপক মিলন মাজি। সহযোগিতায় অধ্যাপক ড. প্রণব বর। সম্পূর্ণ বর্গের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন উলুবেড়িয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. হেমন্ত ত্রিপাঠি।

সঙ্ঘের মালদহ জেলা কার্যালয়ের ভূমিপূজা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ৪ নভেম্বর মালদহ জেলার সাহাপুরে অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা কার্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ভূমি পূজন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাকসোল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী বৈবসানন্দজী মহারাজ, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর আমন্ত্রিত সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী এবং অদ্বৈতচরণ দত্ত,উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক হৃষীকেশ সাহা, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ অধিকারী, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্যামাচরণ রায়, সহ প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী-সহ সঙ্ঘের অন্যান্য অধিকারীরা। সকাল ন'টায় জেলা সঙ্ঘচালক নির্মল কুমার নাথ এবং গৌড় সংস্কৃতি উত্থান ট্রাস্টের চেয়ারম্যান রামেশ্বর পালের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে ভূমিপূজন শুরু হয়। মালদহ জেলার ১২টি খণ্ড এবং দু'টি নগরের ১৪৭টি স্থান থেকে শাখার পবিত্র মৃত্তিকা ভূমিপূজন স্থানে অর্পণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্থান থেকে স্বয়ংসেবক ও মাতা-ভগিনী-সহ প্রায় ৭৫০ জন উপস্থিত ছিলেন।

ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মেলন

গত ২৮ অক্টোবর বসিরহাটে আয়োজিত হয় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের শাখা সংগঠন ভারতীয় পোস্টাল এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের বিজয়া সম্মেলন। সংগঠনের বারাসাত বিভাগের উদ্যোগে বসিরহাট জোনে সর্বপ্রথম এই বিশাল বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ৩০০ জন সদস্য এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের প্রদেশ সম্পাদক শুভদীপ চৌধুরী, বসিরহাট জেলার সঙ্ঘচালক প্রবীর সরদার। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরম বৈভবশালী ভারতবর্ষ গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করে সকলে অনুষ্ঠানস্থ ত্যাগ করেন।

দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলা মহিলা সমন্বয় সমিতির পক্ষ থেকে গত ৩ নভেম্বর তিনটি স্থানে (নিষাদ বাগ, কাশিমবাজার শিশুমন্দির, ইন্দ্রপ্রস্থ বেলতলা অঞ্চলে) জনজাতি ভাইবোন-সহ যানবাহন চালকদের ভাইফোঁটার কার্যক্রম উৎসাহ- উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ মুর্শিদাবাদ জেলার সহ সঙ্ঘচালক গিরিধারী ঘোষ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির জেলা কার্যবাহিকা পলভা গোস্বামী ও জেলা বৌদ্ধিক প্রমুখ চন্দনা বিশ্বাস

অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের ‘জাতীয় পাঠ্যক্রম-২০২৩’ বিষয়ক কার্যশালা

গত ২৮ অক্টোবর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ (বিদ্যালয় শিক্ষা)-এর উদ্যোগে কলকাতার বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাঘরে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (এনইপি),২০২০ ও ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (এনসিএফ),২০২৩-এর উপর একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজিত হয় । কেন্দ্রীয় ভাবে সারা দেশে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ কার্যকর হওয়ার পর আগামী দশকগুলিতে দেশের শিক্ষার দিশা সময়োপযোগী করার জন্য গত বছর বলবৎ হয় জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক)। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পূর্বক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদক আলোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক, রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, রাজ্য সহ-সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল ও সহদেব সাহা-সহ অন্যান্য রাজ্যস্তরীয় কার্যকর্তা। এই কর্মশালায় রাজ্যের ১৬টি জেলা থেকে ৭৫ জন শিক্ষক ও শিক্ষিকা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকরা এই কার্যশালায় অংশগ্রহণ করেন। প্রদীপ প্রজ্বলন এবং সরস্বতী বন্দনার মাধ্যমে কার্যশালার সূচনা হয়। প্রথমে সংগঠনের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি প্রামাণিক সকলের সঙ্গে পরিচয়, স্বাগত বক্তব্য এবং এই কার্যশালার উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। কীভাবে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয়ত্ব বিবর্জিত হয়ে মেকলীয় শিক্ষানীতির অনুসারী হয়ে উঠেছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি,২০২০-র মাধ্যমে কীভাবে দেশীয় শিক্ষাপ্রণালী ভারতীয়ত্বে জারিত হয়ে উঠছে— সেই বিষয়সমূহ তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক তথা ব্যারাকপুর শিক্ষা জেলার সভাপতি সন্দীপ সেনগুপ্তর পৌরোহিত্যে শুরু হয় প্রশিক্ষণ পর্ব। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, কলা, ভাস্কর্যের সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সংমিশ্রণে কীভাবে সৃষ্টি হবে সময়োপযোগী ভারতীয় শিক্ষা ধারা এবং ভারতীয় শিক্ষার গৌরবময় পরম্পরার প্রয়োগ শ্রেণীকক্ষে কীভাবে শিক্ষকরা করবেন— তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। জাতীয় শিক্ষানীতির মৌলিক উদ্দেশ্য কীভাবে শ্রেণীকক্ষে সাধিত হবে তার রূপরেখা তিনি বর্ণনা করেন। দ্বিতীয় সত্রে, সন্দীপবাবু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের হাতে-কলমে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যক্রমের রূপরেখা অনুযায়ী কীভাবে পাঠ একক ধরে পাঠ-পরিকল্পনা করতে হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন। বিষয় অনুসারে এক-একটি গ্রুপ হিসেবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নতুন রূপরেখা মেনে পাঠ পরিকল্পনা করেন। কার্যশালার শেষে সমাপ্তি বক্তব্য এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি অনিমেষ মণ্ডল। কল্যাণ মন্ত্রের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ হয়।

বালিবেলা ও বাঁকুড়ায় লোকপ্রজ্ঞার উদ্যোগে আলোচনাচক্র

অখিল ভারতীয় প্রবুদ্ধমঞ্চ প্রজ্ঞাপ্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা ‘লোকপ্রজ্ঞা’র উদ্যোগে গত ৭ ও ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় ‘সন্তান মানুষ করা’ বিষয়ক আলোচনাচক্র। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটি ছিল হুগলির বালিবেলা সরস্বতী শিশুমন্দিরে। বিদ্যাভারতী পরিচলিত বিদ্যালয় এবং বালিবেলা সরস্বতী শিশুমন্দিরের সঙ্গে লোকপ্রজ্ঞার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল বাঁকুড়া জেলার বদড়া সরস্বতী শিশুমন্দিরে। দু'টি অনুষ্ঠানেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লোকপ্রজ্ঞা ও বিদ্যাভারতীর কার্যকর্তারা। পূজনীয় মহারাজের আশীর্বচন শুনতে উভয় অনুষ্ঠানেই দ্বিশতাধিক মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানগুলিতে মায়েদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। স্কুল পাঠ্যের পুঁথিগত বিষয়ের পাশাপাশি সন্তানদের মধ্যে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া যে অত্যন্ত প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে পিতা-মাতার ভূমিকাই যে প্রধান, সেই বিষয়ে বক্তব্যের মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী মহারাজ।

রাসলীলা

কখনও শ্যাম কখনও শ্যামা

নন্দলাল ভট্টাচার্য

রস থেকে রাস

ভগবান নিদ্রা যান— মানুষের মতোই রাতে। জাগেন দিনে। বিষ্ণু তথা দেবতাদের দিন ও রাত্রি জাগতিক হিসেবে ছ'মাস করে। শাস্ত্রমতে, দেবতাদের জাগরণ কালটাই পূজা-অর্চনার প্রশস্ত সময়। সূর্যের চলন অনুযায়ী এই পর্বের নাম উত্তরায়ণ। অন্যদিকে দেবতাদের রাত্রি তথা দক্ষিণায়ন তা বলে পূজাবর্জিত নয়। অকাল অর্থাৎ দেবলোকের নিশাকালেও হয় পূজা, অবশ্যই বোধন অথবা তাঁদের জাগিয়ে তুলে।

লক্ষ্য করার বিষয়, হিন্দুর বেশিরভাগ পূজাই হয় শরৎ ও বসন্তকালে। তাই এসব পূজা শারদ অথবা বাসন্তিক নামে অভিহিত।

এই হিসেবে দক্ষিণায়ন তথা শরৎ-হেমন্তের প্রায় অন্তিম অনুষ্ঠান রাসযাত্রা। বৈষ্ণব সাধনার অনুষঙ্গে রাসলীলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্ব। এই সাধনকেন্দ্রে রয়েছেন রাধা ও কৃষ্ণ। প্রায় সমগ্র ভারতজুড়ে রাসযাত্রা পালিত হয় আন্তরিকতা, অপরিসীম ভক্তি এবং মহা আড়ম্বরের সঙ্গে।

রাস শব্দের মূলে রয়েছে রস। রাস হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম মধুর রস। রাসের সঙ্গেই আশ্লিষ্ট লীলা। লীলার অর্থ ক্রীড়া। সব মিলিয়ে রাসলীলা হলো রাধা-সহ গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারঙ্গ। এই ক্রীড়ার বৈশিষ্ট্য বৃত্ত বা মণ্ডলকারে সমবেত নৃত্য। প্রাথমিকভাবে এই মণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থান রাধা ও কৃষ্ণের। কালের প্রবাহের সঙ্গে অবশ্য এই মণ্ডলের প্রতিটি গোপীর সঙ্গেই রঙ্গে মাতেন কৃষ্ণ। মাতেন নিজেকে এক থেকে বহুতে বিভাজিত করে। অর্থাৎ ওই নৃত্যক্রীড়ায় প্রতিটি গোপিনীর অনুভবে কৃষ্ণই ছিলেন তাঁদের সীলাসঙ্গী।

রাস—শারদ ও বাসন্তিকা

বৈষ্ণবীয় ভাবধারায়, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লীলা রাস। বার্ষিক এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রসপূর্ণ বা তাত্ত্বিক রস-সমৃদ্ধ কথাবস্তুর এক আধ্যাত্মিক আস্বাদনের সাধনায় মগ্ন থাকেন সাধকরা। এক অর্থে রাসযাত্রা হলো উত্তরণের উৎসব। এ উত্তরণ হলো জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায়, প্রতিদিনের পার্থিব সুখানুভূতিকে আধ্যাত্মিকতায়, সকাম মিলন ইচ্ছাকে নিষ্কাম প্রেমানুভূতি বা প্রকৃতিতে রূপায়ণের প্রয়াস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় 'হর্ষচরিত'-এর টীকাকার শঙ্করের কথা। তাঁর ব্যাখ্যা, রাস হলো এক ধরনের বৃত্তাকার নাচ। ষোলো বা বত্রিশজন সম্মিলিত ভাবে এই নৃত্য উপস্থাপনা করে। অবশ্য এটা হলো একটি লৌকিক নৃত্যানুষ্ঠান। শাস্ত্রীয় মতে রাস হলো এক ধরনের ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক সাধনা।

একদিক থেকে রাস উৎসবের সঙ্গে দুর্গা পূজার রয়েছে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য। দুর্গাপূজা হয় শরৎকালে মহিষমর্দিনী রূপে এবং বসন্তকালে বাসন্তী পূজা হিসেবে। একই ভাবে রাসও হয় দু'বার। একবার শরৎকালে এবং অন্যবার বসন্তকালে। এ সম্পর্কে 'পদ্মপুরাণে' (৫২/১০৩-১০৫) বলা হয়েছে, রাস দু'রকম,— শারদরাস এবং বাসন্তী রাস।

পদ্মপুরাণ ছাড়া অন্যান্য পুরাণেও দু'রকম রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে (ব্রহ্মখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়) রয়েছে বাসন্তী রাসের কথা। শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে (৫।১৩/১৪-৬১) রয়েছে কেবলমাত্র

শারদরাসের কথা। এসব উল্লেখ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, দুর্গাপূজার মতোই রাসও হয় দু'বার।

রাস—দুই রূপ

রাসলীলা গূঢ় রহস্যময়। সবিশেষ তাৎপর্যবহ এই শব্দবন্ধ। এ যেন সাগরের মতোই অনন্ত। আকাশের মতোই অশেষ-অসীম। রূপক আর বাস্তবে মাখামাখি এই রাস। এর তাৎপর্য অনুধাবন অনেকটা অশ্বের হস্তীদর্শনের মতো। যে যেভাবে যেদিন থেকে দেখবে— সেভাবেই তা নেবে একটি রূপ। সে রূপে বিমোহিত ভক্ত কেন, সাধারণ মানুষও।

রস থেকে রাস। একথা বলা হয়েছে আগেই। উপনিষদ বাক্য— রসই ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদের কথা, তিনিই প্রকৃতপক্ষে রস। এই রসকে অনুভব করতে পারলেই হওয়া যায় পরমানন্দময়। এই রসের সন্ধান দিতে গিয়েই শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ'-তে বলেছেন, রস হলো একটি উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা। ভগবানের মধ্যে নিহিত এই রস অর্জন করা যায় আধ্যাত্মিক দেহ বা সাধনার মাধ্যমে। রাসে ভক্ত নিষ্ক্রিয় দর্শক না হয়ে ভক্তির আবেশে সক্রিয় ভাবেই বিভোর হয়। শ্রীরূপ গোস্বামীর অনুভবে, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত রসের মূর্ত প্রতীক।

রাসের দুটি রূপ। একটি বহিরঙ্গ, অন্যটি-অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে এই রাসলীলার অবতারণা করেছিলেন। প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব অনাস্বাদিত এক আনন্দে সমগ্র বৃন্দাবনকেই মাতিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর পঞ্চভাবের সে প্রকাশে নন্দ-যশোদা বাৎসল্য রসে আপ্লুত হয়েছিলেন। গোপবালকরা সখ্যভাবে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। বৃন্দাবনের গোপিনীরাও একই ভাবে হয়ে উঠেছিলেন কেবলই কৃষ্ণময়। তাঁকেই কামনা করেছিলেন তাঁরা একান্তভাবে। বৃন্দাবনের সকলেই কৃষ্ণকে চেয়েছিলেন আপনজন হিসেবে। চেয়েছিলেন কেবলই নিজের নিজের জন্য। আর সকলের সেই হাওয়া— সেই কামনা পূর্ণ করার জন্যই নানালীলায় মাতেন কৃষ্ণ বৃন্দাবনে। তাঁর ওই পৌগণ্ড বা প্রাক্-কৈশোর লীলারই অন্যতম হলো রাস।

বৃন্দাবনের আর সকলের মতোই গোপিনীরা প্রতেকেই চেয়েছিলেন কৃষ্ণকে কেবলমাত্র তাঁরই করে। সেই কামনাতেই তাঁরা করেছিলেন কাত্যায়নী ব্রত পালন। একইসঙ্গে বস্ত্রহরণের পরই কৃষ্ণ আশ্বাস দিয়েছিলেন সকলকে— আগামী কার্তিকী পূর্ণিমায় তিনি পূরণ করবেন সকলের সব কামনা।

কার্তিকী পূর্ণিমার সেই রাতে

অবশেষে এল পূর্ণিমার সেই মহিমাময় রাত। শ্রীকৃষ্ণ কদম্ববনে তাঁর বাঁশিতে তুললেন স্বর। সেই বাঁশির সুর কানে পৌঁছনো মাত্র গোপিনীরা যে যেখানে--- যেখানে ছিলেন--- সেই ভাবেই সব বাধা--- সব বিধি-নিষেধকে তুচ্ছ করে ছুটে যান বাঁশির সুরের উৎস বৃন্দাবনের সেই কদম্ব বনে।

গিয়ে তাঁরা দেখেন মোহন নটবর বেশে কদমগাছে হেলান দিয়ে আপনমনে বাঁশি বাজিয়ে চলেছেন কৃষ্ণ। কোনোদিকে হুঁশ নেই তাঁর। ওদিকে গোপীরা তখন তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আকুল হয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন।

কেটে যায় বেশ কয়েকটা মূহূর্ত। এক সময় থামে বাঁশি। বাঁশি থামলেও কৃষ্ণ কিন্তু তখনই সকলের কাছে ধরা দিলেন না। বরং নানা নীতি উপদেশ দিয়ে সকলকে ঘরে ফিরে যেতে বলেন। কিন্তু সে কথায় কান দেন না গোপীরা। সবকিছু পরিভাগ করে তাঁরা সকলেই তখন কৃষ্ণময়। সকলেই একাত্ম ভাবে চান কৃষ্ণকে।

সব ছেড়ে ভক্তরা যখন কেবলই ভগবানময়, তখন ভগবানও দূরে থাকতে পারেন না। ধরা দেন তিনি ভক্তদের কাছে। এখানেও হলো তাই। মিলিত হলেন তিনি সকলের সঙ্গে। আহ্লাদিত গোপীরা কৃষ্ণকে কেন্দ্রে রেখে মেতে ওঠেন নৃত্য-গীতে। সেই মুহূর্তে অহমিকা গ্রাস করে গোপীদের। প্রত্যেকেই ভাবেন, কৃষ্ণ কেবল। তাঁরই— অন্য কারও নন। সকলের সেই ভাবনার মুহূর্তেই যেন মধ্যাহ্নে নামে ঘন অন্ধকার। কৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। হাহাকার করে ওঠেন গোপীরা। সব অহংকার ভুলে এবার তাঁরা পুরোপুরি শরণাগত কৃষ্ণের। কৃষ্ণও এবার ধরা দিলেন তাঁদের কাছে। এক তিনি বহু হয়ে পূর্ণ করলেন বৃন্দাবনের গোপীদের মনের সব বাসনা। পূর্ণিমার সোনাঝরা জোছনায় শুরু হলো রাসনত্য বৃত্তাকারে ঘুরে ঘুরে। সে নৃত্যলীলায় প্রতিটি গোপীই আবিষ্ট— কৃষ্ণ-সঙ্গ পাওয়ার সুখে।

রাসলীলা যে নৃত্য-ক্রীড়া, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেছেন, 'রাসো নাম বহু নর্তকীযুক্তে নৃত্যবিশেষঃ।' একই কথা বলেছেন আরেক টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও। শ্রীমদ্ভাগবতের কথা, কার্তিকী শারদ পূর্ণিমার সেই রাতে দেবী যোগমায়াকে সামনে রেখেই শ্রীকৃষ্ণ অবতারণা করেছিলেন রাসলীলার।

জীবাত্মা—পরমাত্মার মিলন

রাসলীলার অন্তরঙ্গ তথা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য, এটা হলো, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলন। অর্থাৎ রাস নিছক কোনো শারীরিক নৃত্য নয়। এই নৃত্যে হলো আত্মার উন্নয়ন তথা আলোকিতকরণ। ঐশ্বরিক যাত্রার এই পথযাত্রীরা সম্পূর্ণভাবে ভক্তি, আত্মসমর্পণ এবং অতিস্ত্রীয় প্রেমের পথে এগয়ে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ লীন হন। এই লীলায় গোপীরা হলেন ভক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণ হলেন ভগবান। আবার অন্য আধারে কৃষ্ণ হলেন পরমপুরুষ এবং রাধা হলেন পরমাপ্রকৃতি। এই দুইয়ের মিলনেই আসে মুক্তি। ভক্তরা তাই এই মিলনকেই করেন জীবনের সার।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপিনীদের এই নৃত্যগীতকে অনেকেই প্রাকৃতজনের আদিরসাত্মক ক্রীড়া বলে চিহ্নিত করেন। নৈতিক কামনা পূরণ এর লক্ষ্য, এমনটাও বলেন কেউ কেউ। কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই উল্লেখ করেন সাধক এবং শাস্ত্রকাররা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এটা ব্যাখ্যা করে পবিষ্কারভাবে বলছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ,— আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।/কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।। (আদি ৪।১৬৫)। কাম ও প্রেমের মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তারই উল্লেখ করে বৈষ্ণব শাস্ত্রকাররা বারবার বলেছেন, দেবাতীত প্রেমের সাধনায় পরমাত্মা যা পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনই হলো রাসক্রীড়ার আসল লক্ষ্য।

ভাগবতে নেই রাধা

কার্তিকী পূর্ণিমায় শারদরাসের কেন্দ্রবিন্দু— শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধা। অথচ ভাগবতে রাধার উল্লেখ নেই। আছে অবশ্য এক প্রধানা গোপীর কথা। রাধার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। রাধা হলেন প্রেম, কোমলতা, করুণা ও ভক্তির দেবী। গোপীশ্রেষ্ঠা রাধাকে বলা হয় লক্ষ্মীর অবতার। সর্বোচ্চ দেবী হিসেবে রাধা হলেন স্ত্রী শক্তির প্রতিরূপ। তিনি কৃষ্ণের হ্লাদিনী বা অভ্যন্তরীণ শক্তি। বলা হয়, রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় আবাস গোলোক।

রাধাকে মনে করা হয় আত্মার রূপক। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে আধ্যাত্মিকবৃদ্ধি এবং ঐশ্বরিক সত্তার (ব্রহ্ম) সঙ্গে মিশনের জন্য মানুষের অনুসন্ধানের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়।

রাধা হলো একটি সংস্কৃত শব্দ। এর অর্থ— 'সমৃদ্ধি, সাফল্য পরিপূর্ণতা

এবং সম্পদ'। রাধার একটি প্রিয় রূপ হলো রাধিকা।

রাধা বৈষ্ণব ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দেবী। রাধাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে রাধাবল্লভ সম্প্রদায়। চৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন-সহ কৃষ্ণায়েত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী হলেন রাধা। এঁরাই সারা দেশে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তির সাধনার সূচনা করেন। ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যে ভক্তি আন্দোলনের ঢেউ ওঠে, তারই সূত্রে রাধাকৃষ্ণের অসাধারণ প্রেমকাহিনি আপামর জনগণকে এক অপূর্ব আনন্দের সন্ধান দেয়। তারই কারণে রাসচক্রে রাধাই হলেন সর্বোত্তম প্রেমের প্রতীক।

শিব হলেন রাধা

বৈষ্ণবদের আরাধ্যা দেবী শ্রীমতী রাধা। লক্ষ্মীর অবতার তিনি। কিন্তু উপপুরাণ মহাভাগবত বা দেবীপুরাণে বলা হয়েছে, রাধা হলেন শিবের অবতার। শিবানীর প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য শিব হন রাধা।

বিচিত্র পুরাণ কাহিনি, এক সময় প্রেমলীলায় বিভোর মহাদেব ললিতা বা মহাদেবীকে বলেন, দেবি, তোমার প্রেমে আমার প্রায় মত্ত অবস্থা? কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হয়, তোমারও কি ঠিক আমারই মাসে অবস্থা। তুমিও কি আমারই মতো আমার প্রেমে বিভোর?

দেবী উত্তর দেন না। কেবল হাসেন। তাতেই মহেশ্বর বলেন, হে দেবি মহেশ্বরী, তোমার মুখের কথা আমি শুনতে চাই না। তুমি হয়েই আমি তোমার প্রেম আস্বাদন করতে চাই।

আবারও হাসেন দেবী। বলেন, বেশ তো, তাহলে আমাদের দুজনেরই ভূমিকা বদল হোক। তুমি হও স্ত্রী আর আমি হচ্ছি পুরুষ। তবে সেটা এখন নয়। আগামী দ্বাপর যুগে অংশ অবতারে তুমি হবে রাধা আর আমি হব কৃষ্ণ। ভ্রাতা হরিকে বলছি, তিনি ওইসময় অবতীর্ণ হবেন অর্জুন রূপে। সেই তোমার আমার দেহাতীত আধ্যাত্মিক প্রেম খুলে দেবে সাধনার এক নতুন দুয়ার।

শিবকে দেহাতীত প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ বোঝাতেই গোলোকে রাধারূপী শিব এবং কৃষ্ণরূপী দেবী ললিতা বা শিবাণী নিত্য রাসক্রীড়ায় মগ্ন হন। শাস্ত্রকাররা বলেন, এই কৃষ্ণ কিন্তু বিষ্ণুর অবতার নন! ইনি হলেন মহাদেবী বা ললিতারই একটি রূপ। এই গোলোকেও নয় বিষ্ণুর গোলোক। এ হলো চিরকালের— শাশ্বত-সনাতন নিত্য গোলোক।

কল্পে কল্পে একই লীলা

এসব পুরাণকাহিনি সহজেই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই বলা হয়, ভগবানের লীলা কেবল একবারই প্রকাশিত হয়নি। কল্পে কল্পে বিভিন্নরূপে অথচ একই নামে তিনি করে বলেছেন লীলাভিনয়।

অনেকের অভিমত, একসময় এদেশে শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর ও গাণপত্যদের মধ্যে ছিল তীব্র সংঘাত। সেই সঙ্ঘাতের কালে সব সম্প্রদায়ই তাঁদের আরাধ্যকে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে রচনা করেন সাম্প্রদায়িক নানা পুরাণ। দীর্ঘ যে বিবাদের শেষে প্রাধান্য পেতে থাকে সমন্বয়ী চিন্তাধারা। সেই ধারাতেই সব সাম্প্রদায়িক দেব-দেবীই মিলেমিশে এক হয়ে যান। বিরোধের পরিবর্তে প্রেম-ভালোবাসায় এদেশের সাধক এবং সাধারণ মানুষ পরস্পরকে কাছে টেনে নেন।

এমনই পরিবেশে রচিত তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয়। মহাকালের স্ত্রী মহালক্ষ্মী ধারায় আবির্ভূত হন কৃষ্ণরূপে আর মহাকাল বা শিব হন রাধা। এরই আলোয় আগম শাস্ত্রের কথা, দশমহাবিদ্যারই এক লীলা প্রকাশ হিসেবে ঘটেছিল দশাবতারের আবির্ভাব। আগম-বেদের বক্তব্য, 'আত্মন শিব গিরিজানাথ'— শিব হলেন পরমাত্মা এবং ভগবতী হলেন মেধা।

এ সম্পর্কে তোড়ল তন্ত্রের দশম পটলের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। সেখানে পরমাত্মা শিবের কাছে দেবী দশাবতারের কথা শুনতে চাইলে তিনি সবিস্তারে বলেন সে কথা। সেখানে দশমহাবিদ্যার প্রতিটি বিদ্যাই যে দশটি অবতার রূপে অবতীর্ণ হন সে কথাই বলেন শিব। তাঁর কথায়, বগলা হন কূর্ম। ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নরসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী শ্রীরাম ইত্যাদি। মহাদেব বলেন, এঁদের পূজা করলে তাঁরই সান্নিধ্য মেলে। ভাগবত পুরাণেও বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণের অভেদত্বের কথা।

লোককথায় কালী : কৃষ্ণ

পৌরাণিক এইসব কাহিনি আলোয় গড়ে উঠেছে বেশকিছু লোককথা। এমনই এক কাহিনিতে বলা হয়েছে, রাসমণ্ডলে রাধাকে বেশি প্রাধান্য দেওয়ায় ঈর্ষাকাতর কিছু গোপী নিয়ে রাধার বাবা-মায়ের কাছে গিয়ে বলেন, রাধা কৃষ্ণভজনা করছেন। পিতা-মাতার ক্রোধ থেকে রাধাকে বাঁচাতে সেই মুহূর্তে বংশীবাদনরত শ্যামসুন্দর যেন শ্যামারূপ। রাধিকার শাক্ত বাবা-মা মেয়েকে শ্যামাভজনা করতে দেখে ঘরে ফিরে যান আনন্দিত মনে।

অন্য কাহিনিতে, কৃষ্ণের এই কালীরূপ দেখেন রাধার স্বামী আয়ান ঘোষ এবং ননদ-শাশুড়ি— জটিলা-কুটিলা। এই শ্যাম-শ্যামা বা কৃষ্ণলীলা হলো সমন্বয়ের একটি রূপ। এই রূপকে কেন্দ্র করেই নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলে বৈষ্ণবীয় রায়ের সঙ্গেই আজও হয়ে চলেছে শাক্তরাস। সেখানে পূর্ণিমার রাতে হয় দেড়শাধিক শক্তিমূর্তির আরাধনা।

ইতিহাস কথা, নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজত্বকালে (১৭২৮— ১৭৮২) নবদ্বীপে ঘটে বৈষ্ণবীয় রাসের রূপান্তর। শাক্তরাজা কৃষ্ণচন্দ্র বৈষ্ণবদ্বেষী না-হয়েও রাসপূর্ণিমার রাতে শক্তিমূর্তি পূজায় উৎসাহ দিতে থাকেন। রাজানুগ্রহের কারণেই সেই শাক্তরাস ছাপিয়ে যায় বৈষ্ণবীয় রাসকে। আর এখন তো তা হয়ে উঠেছে এই অঞ্চলের এক বিশেষ ঐতিহ্য।

মণিপুরি রাস

ব্রজভূমি-সহ সারা দেশের রাস উৎসবের মধ্যে মণিপুরের রাস এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। নানা সূত্রের কথা, ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরের মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র স্বপ্ন দেখে সেখানে রাস উৎসব বা নৃত্যের প্রচলন করেন। মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রর মৃত্যুর একশো বছর মহারাজ চন্দ্রকীর্তির রাজত্বকালে মণিপুরের রাসনৃত্য সারা দেশেই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গদেশে মণিপুরী এই রাসনৃত্যর সূচনা হয় ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। পরে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ পোষণায় বাংলাদেশি মণিপুরীদের রাস-নৃত্যর মহিমা পৌঁছয় বিশাল জনসমষ্টির কাছে।

সমন্বয়ের স্বরূপ

রাস একটি ধর্মীয় উৎসব। বঙ্গপ্রদেশে শান্তিপুরে সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয় রাস উৎসব। এই অনুষ্ঠানের কেন্দ্রমণি রাধা ও কৃষ্ণ। এঁরা হলেন জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রতীক। মূলত বৈষ্ণবদের সাধনার অন্যতম অঙ্গ রাস। শাক্তদের মধ্যে রাসপূর্ণিমা তিথিতে রাসকালী পূজার প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পুঞ্জমেঘ ছেয়ে রেখেছে জাতীয়-জীবনের নীল আকাশ। এই উৎসব হয়ে উঠেছে সমন্বয় ও জাতীয় সংহতিরও প্রতীক। একই সঙ্গে এই উৎসবের মূল দেবতা রাধাকৃষ্ণর প্রেম কাহিনি দেশের সংস্কৃতি এবং সাহিত্যকেও নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। সব মিলিয়ে রাস উৎসব ভারতীয় ধর্মসাধনা এবং ঐতিহ্যের উষ্ণ প্রাণস্পন্দন। ▯

ভগবানের অভিমুখে ভক্তের নিষ্কাম যাত্রা-ই রাসযাত্রা

মিলন খামারিয়া

রাসলীলা শব্দটি রাস ও লীলা আলাদা আলাদা শব্দের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে। রাস শব্দটি এসেছে রস শব্দ থেকে, এই রস আনন্দরস। সংস্কৃতে রাস শব্দের অর্থ অমৃত আর লীলা শব্দের অর্থ অভিনয়। তত্ত্বগতভাবে রাস উৎসব গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই উৎসব ভক্তের সঙ্গে ভগবানের মিলিত হওয়ার যাত্রা। সেইজন্য একে রাসযাত্রা বলা হয়। কার্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে এই রাসযাত্রা পালিত হয় ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। বিশেষ করে মণিপুর রাজ্যে রাসযাত্রা পালিত হয় বিশাল আয়োজন সহকারে। বৃন্দাবনে মহাসমারোহে পালিত হয় রাসযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কোচবিহার, মায়াপুর; উত্তর চব্বিশ পরগনার খড়দহ, পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নাতে বিশেষভাবে পালিত হয় রাসযাত্রা। এই দিনটি বৈষ্ণবদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনের লীলা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এই মহাপুরাণেই বিধৃত হয়েছে রাসযাত্রা ও তার উৎসকথা। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীরাধার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার কথা বিশেষ ভাবে বিবৃত হয়েছে। তবে মূলত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ২৯-৩৩ পাঁচটি অধ্যায়কে রাসপঞ্চাধ্যায়ী বলা হয়। রাসলীলার পক্ষে বিপক্ষে বহু কথা প্রচলিত। এ সকল কথা ছাপিয়ে রাসলীলা হলো ভক্ত ও ভগবানের মিলনের উৎসব। যখন অন্ধকার হৃদয়ে জ্ঞান ও ভক্তির আলোক এসে পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে হৃদয়কে আলোকদীপ্ত করে তোলে তখনই তাকে রাস বলে। লালনের ভাষায় :

'অমাবস্যায় পূর্ণিমা হয়
মহাযোগ সেই দিনে উদয়।
লালন বলে তাহার সময়
দণ্ড রহে না।
সময় গেলে সাধন হবে না।'

রাসলীলা কামের প্রবর্তনের জন্যে নয়, কামের নিবর্তনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। কাম থেকে কামাতীত হওয়া। গোপীদের হৃদয় ছিল কামনাহীন নিষ্কাম প্রেমদ্বারা পূর্ণ। তাইতো শ্রীমদ্ভাগবতে খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে বোঝানো হয়েছে।

'ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতা ক্বথিতা ধানা প্রায়ো বীজায় নেশতে।।'

(শ্রীমদ্ভাগবত : ১০.২২.২৬)

'আগুনে ভাজা বীজে যেমন অঙ্কুরোদয় হয় না, ঠিক একইভাবে যাদের চিত্ত শ্রীভগবানের প্রতি আবিষ্ট তাদের কামনা সাংসারিক বিষয়ভোগে কখনোই পরিণত হয় না।' লালন সাঁই বলেছেন :

'আত্মতত্ত্ব যে জেনেছে
দিব্যজ্ঞানী সে হয়েছে।'

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কাম বাসনার দ্বারা চালিত বা আকৃষ্ট হলেও তিনি জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন, তাঁর দৃষ্টান্ত হলেন 'কুব্জা'। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে কাম বাসনা নিয়েই গমন করেছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের চরণের সুগন্ধ আঘ্রাণ করেই তিনি কাম বাসনা থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগবানের কাছে নারী ও পুরুষের কোনো ভেদাভেদ নেই, কেননা প্রতিটি জীবের মধ্যেই তিনি বিরাজমান। প্রকৃতপক্ষে, পরমেশ্বর ভগবান জগতে একমাত্র পুরুষ বা ভোক্তা, আর সকলই প্রকৃতি। শুদ্ধ যোগের মধ্যেই ভগবানকে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলেছেন :

'কাম, প্রেম-দোহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ।।'

লোহা ও সোনায় যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনই জাগতিক কাম বাসনা এবং গোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাও সম্পূর্ণভাবে

আলাদা। এ রাসলীলা বা প্রেমলীলার সঙ্গে বর্তমানকালের জাগতিক কাম এবং কামোদ্ভূত বাসনার আপাত সাদৃশ্য থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা। জাগতিক প্রেম এবং আধ্যাত্মিক নিষ্পাপ প্রেমের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে, নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম; পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি ইন্দ্রিয়ের প্রীতির ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম।

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি, 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম।।'

রাস উৎসবের মূল নিহিত আছে কৃষ্ণ ও গোপীদের সম্পর্কের মধ্যে। এখানে কৃষ্ণ ও গোপীগণকে ভক্ত ও ভগবানের প্রতীক বলে ধরতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে ভালোবাসেন গোপরমণীরা। তাঁরা শাস্ত্রজ্ঞ বা পণ্ডিত নন, কেবল ভালোবাসা দিয়েই তাঁরা কৃষ্ণের সান্নিধ্যলাভ করেছেন। শাস্ত্র সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বলা হয়, 'এতে চাংশ কলা পুংশ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' সকলে ঈশ্বরের অংশ বা কলা হলেও শ্রীকৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান।

ভাগবতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অনুরাগী গোপরমণীদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন। স্নানরতা রমণীগণ তাঁরই কাছে বস্ত্রকামনা করেছেন। ভগবান ভক্তের সমস্ত পাপ, লজ্জা, ঘৃণা, ভয়কে আকর্ষণ করে নেন। সেই শূন্যতার মধ্যে তিনি নিজে ভক্তহৃদয়ে বিরাজিত হন। এই বস্ত্রহরণের দিন কৃষ্ণ গোপীদের কাছে অঙ্গীকার করেন, পরবর্তী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি বৃন্দাবনে রাসলীলা করবেন।

'যখন করেন হরি বস্ত্রহরণ।
গোপীদের কাছে তিনি করিলেন পণ।।
আগামী পূর্ণিমাকালে তাঁহাদের সনে।
করিবেন রাসলীলা পুণ্য বৃন্দাবনে।।'

রাসের যে কাহিনি আমরা ভাগবতে পাই তা কিন্তু খুবই বিচিত্র। ভাগবতে শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলছেন—

'ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ।।'

পূর্বনির্দিষ্ট সেই শরৎকালীন মল্লিকা সুশোভিত শারদপূর্ণিমা রাত্রি। সেই রাত্রির শোভা দেখে ভগবান যোগমায়ার সাহায্যে গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে ইচ্ছুক হলেন। তাই শারদ পূর্ণিমার তিথিতে কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বাঁশিতে সুর তুলে গোপীদের আহ্বান করেন। এই সুর অনঙ্গবর্ধক সুর। যমুনার তীরে যে স্থানে তিনি বসে গোপীদের আকর্ষণ করেছিলেন সেই স্থানটি 'রাসোওলি' নামে খ্যাত। কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হলেন গোপীগণ তাঁর বাঁশি শুনে। বংশীধ্বনি শুনে চঞ্চল হয়ে উঠলেন গোপীরা। যমুনা তটে অবস্থিত তখন কোনও গোপী দুগ্ধ দোহন করছিলেন, তিনি কালবিলম্ব না করে সেই অবস্থায় চলতে লাগলেন। কেউ দুধ জ্বাল দিচ্ছিলেন, তিনি চুল্লির উপর দুধের পাত্র রেখেই রওনা দিলেন। কেউ যব বা গমের রুটি তৈরি করছিলেন, সেই অর্ধ-সেঁকা রুটি রেখে কালবিলম্ব না করে ধাবিত হলেন। কোনও কোনও গোপী গৃহে অন্নাদি পরিবেশন করছিলেন কিংবা স্বামীসেবা করছিলেন, কেউ-বা অন্নগ্রহণ করছিলেন। সকলেই তাঁদের কাজগুলি অসমাপ্ত রেখে উঠে দাঁড়ালেন। এত দ্রুত তাঁরা যমুনাতটে উপস্থিত হলেন যে শরীরের ঊর্ধ্বভাগের বসন নিম্নভাগে বা নিম্নভাগের বসন ঊর্ধ্বঙ্গে ধারণ করেই চলে এলেন। বসনবৈষম্য তাঁদের মনে কোনও বিকার সৃষ্টি করল না। যাঁরা গৃহে স্বামী বা পিতার নিষেধে অবরুদ্ধ হয়ে রইলেন তাঁরা অশ্রুপূর্ণ চোখে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এর ফলে সূক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণের কাছে। ঈশ্বর লাভের প্রতি ভক্তের তীব্র ব্যাকুলতার যে চিত্র ভাগবতে তুলে ধরা হয়েছে তা একেবারে অসামান্য।

গোপীরা উপস্থিত হওয়ামাত্র কৃষ্ণ তাঁদের সঙ্গে নৃত্য করতে থাকলেন— এমনটি কিন্তু নয়। প্রথমে কৃষ্ণ এই ব্যাকুল গোপীদের পরীক্ষা করার জন্য বাক্যজাল বিস্তার করে বললেন, 'এত রাত্রে তোমরা গৃহের কার্য অসম্পূর্ণ রেখে, কর্তব্যগুলি সমাপ্ত না করেই চলে এলে? গৃহের কর্তব্য করা প্রতিটি নারীর ধর্ম, আর এই বনের মধ্য দিয়ে আসতে ভয় করল না? যে কোনও বিপদ আসতে পারত। তবে দেখ এই বৃন্দাবন এমনিতেই সুন্দর, তাতে আবার পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়েছে। পাশ দিয়ে যমুনা বহমান, কী সুন্দর মৃদু-মৃদু বাতাস বইছে। সেই বাতাসের ছোঁয়ায় দেখ তরুলতাগুলো স্পন্দিত হচ্ছে। আজ আমি আনন্দিত। তা, গোপীগণ তোমাদের পিতা-মাতা, অভিভাবকগণ তোমাদের খোঁজ করবেন না? তা খোঁজ করাই স্বাভাবিক। তোমাদের তাই বলি, এখনই গৃহে ফিরে যাও!'

গোপীগণ একথা শুনে অবাক! এত রাতে নিজেই বাঁশিতে ডেকে এনেছেন, কিন্তু এখন আবার উলটো কথা বলছেন! কৃষ্ণের কথা শুনে গোপীদের মুখ মলিন হলো, অভিমান হলো, তাঁদের কেউ কেউ মুখ নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। কেউ-বা নাকের পাটা ফুলিয়ে রাগ দেখাতে লাগলেন। কেউ মুখ ফিরিয়ে রইলেন। আবার কেউ বলে উঠলেন, 'আমরা লজ্জা, ভয়, কর্ম ত্যাগ করে এসেছি ঠিকই, এতে হয়তো ধর্মচ্যুত হবো, কিন্তু আমরা তোমার আশ্রিত, তুমি যদি আমাদের ত্যাগ করো তবে তুমি নিশ্চিত আরও পাপের ভাগী হবে। শরণাগতকে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য।' শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলছিলেন তখন গোপীগণ কৃষ্ণের চারিদিকে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ক্রমাগত বলে চলেছিলেন, 'পতি পরিত্যাগ আমাদের ধর্ম কী অধর্ম তা পরে দেখা যাবে, কিন্তু আমাদের পরিত্যাগে তোমারই ধর্মদোষ বর্তাবে তা অপরিহার্য।' গোপীদের এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে যূথপতির মতো সেই যমুনা তটে বৈজয়ন্তীমালা ধারণ করলেন এবং গোপীদের সঙ্গে ক্রীড়া করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ অতিক্রান্ত হলো, হঠাৎ সব গোপরমণীই মনে করলেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই সঙ্গে নৃত্য করছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁরই। মণ্ডলাকারে এই নৃত্য যখন খুব তন্ময়তা সৃষ্টি করেছে তখন প্রত্যেক গোপী কৃষকে একান্ত নিজের মনে করলেন এবং নিজেকে রমণীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা বলে অনুভব করলেন। এই ভাবনা তাঁদের গর্বিত করল। সেই গর্ব তাঁদের ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করল। যেই এই ব্যবধান রচিত হলো অমনি নৃত্যরতা গোপীদের ছেড়ে কেবল একজনকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ বনের গভীরে প্রবেশ করেন। যে গোপী অহংকারে স্ফীত হননি। যিনি গভীরভাবে কেবল শ্রীকৃষ্ণসঙ্গেই তৃপ্ত ছিলেন তাঁকে নিয়েই শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে সরে যান।

গোপীগণ বললেন, 'এই রমণী নিশ্চয় ভগবান হরির আরাধনা

করেছিলেন, তা না হলে কি গোবিন্দ আমাদের পরিত্যাগ করে প্রীতি সহকারে তাঁকে এই নির্জন স্থানে নিয়ে এসেছেন।' যে গোপরমণীকে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ সকলের থেকে পৃথক হয়ে যান তিনি রাধা। শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গোপীদের চমক ভাঙে তাঁরা কৃষ্ণ-অন্বেষণে ব্যাকুল হন এবং শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকেন, এই সময় তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্মরণ করে নিজেরা তাঁর পূতনাবধ, গোবর্ধন ধারণ, কালীয় দমন ইত্যাদি ঘটনা অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন। এদিকে যে গোপীকে একান্তে গিয়েছিলেন তিনিও নিজেকে একসময় নিজেকে শ্রেষ্ঠা ভাবতে থাকেন। অবশেষে তিনি বসে পড়ে বলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমি আর বনভ্রমণ করতে পারছি না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে আমাকে নিয়ে চল।' শ্রীকৃষ্ণ একথা শুনে বললেন, 'বেশ, তবে আমার কাঁধে ওঠ।' গোপী যেই কৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করতে গেলেন অমনি শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হলেন। একান্ত বিলাসিনী গোপী তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে, 'হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ' শব্দে ক্রন্দন করতে লাগলেন। গোপীগণ সেই কান্নার শব্দে নিভৃত স্থানটি খুঁজে পেলেন কিন্তু তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে খুঁজে পেলেন না। এরপর তাঁরা অনেক আকুতি ও শরণাগতি নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলে শ্রীকৃষ্ণ আবার সেই ফিরে এলেন। তাঁরা সকলে ফিরে এলেন যমুনার তটে। আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্র, বালুতটের বালু স্নিগ্ধ। এই লীলা দর্শন করার জন্য আকাশের চাঁদ তার গতি স্তব্ধ করেছে, গ্রহগণ একস্থানে স্থির হয়ে রয়েছে। তাই রাত্রি তার পরিক্রমা শেষ না করে অতি দীর্ঘ হয়ে উঠল। রাসলীলাকে যেন সে নিজ অঙ্গে জড়িয়ে রাখল। শ্রীকৃষ্ণ এই সময় তাঁর গোপীদের নিয়ে বনক্রীড়া, জলক্রীড়া করতে লাগলেন। গোপীদের মুখ ভালোবাসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাতে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে এত শোভা ধারণ করল যা দেখে ভ্রমর পুষ্পস্তবক ভেবে রাতেই গুনগুন করতে লাগল। বিমানচারিণী দেবীরাও গোপীদের সুখতৃপ্ত-মুখ মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলেন। দেবতারাও উঁকি মারলেন। দেবর্ষি নারদ তখন দেখলেন, ষোড়শ সহস্র গোপীর সঙ্গে ষোড়শ সহস্র কৃষ্ণ নৃত্য করছেন। ধীরে ধীরে ঊষা উপস্থিত হলো। ব্রাহ্মমুহূর্তে গোপীগণ যে যাঁর গৃহে ফিরে গেলেন। সমস্ত রাত যে আন্দোলন হলো তাই ভাগবত বর্ণিত রাস বা রাসযাত্রা।

এই কাহিনির মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক ক্ষেত্রটি হলো শ্রীকৃষ্ণ কী করে একই সঙ্গে সকলকে পৃথকভাবে সঙ্গদান করলেন। বলা হয়, এক্ষেত্রে কৃষ্ণ যোগমায়ার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। যে মায়ার আবেশে গোপীগণের মনে হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই পৃথকভাবে বিরাজ করছেন। দ্বিতীয়, গোপীগণ অত্যন্ত দীনভাবের অনুসারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টিও একটি বিরল ঘটনা। ভক্ত ও ভগবানের মিলনের পথে যে ক'টি বাধার বিষয় আমরা দেখি। অন্তরায়গুলি অপসারণের পথও কৃষ্ণলীলায় পরিস্ফুট হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম টীকাকার তাই বলেছেন, 'নৃত্যগীতচুম্বনালিঙ্গনদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তময়ী যা ক্রীড়া' বা রাসক্রীড়া রূপে চিহ্নিত। যদি আমরা আরও গভীরে প্রবেশ করতে চাই তাহলে বলতে পারি, রাস হলো জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের সুখানুভূতির সার্থক লোকায়ত বর্ণনা। যে বর্ণনার মধ্য দিয়ে মানুষ খুব সহজে ক্ষুদ্র আমির সঙ্গে বৃহৎ আমির মিলনের ক্ষণটি বুঝতে সক্ষম হবে। বৈষ্ণবভাব মূলত দ্বৈতভাব। ভগবান, প্রভু ও আমি ভক্ত, তাঁর দাস। কিন্তু রাস উৎসবের মধ্য দিয়ে ভক্ত ও ভগবান অদ্বৈত, এক হয়ে যাওয়ার অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ ব্রহ্ম রস ব্যতীত আর কিছুই নন। বৈষ্ণবদর্শনে এই রসকে মধুর রস বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

তত্ত্বগত ভাবে রাস উৎসব যতই গভীর হোক না কেন বাস্তবে এই উৎসবটি কিন্তু মধুরভাবে পালিত হয়। ভগিনী নিবেদিতা এই উৎসবটির বর্ণনাকালে বলেছেন, 'কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিটিতে কেউ চাঁদকে কি দেখেছেন? আমাদের উৎসবগুলি চাঁদের গতিবিধির উপর যেন বেঁধে দেওয়া এক কাব্য। প্রতিটি পূর্ণিমা, প্রতিটি অমাবস্যায় কিছু না কিছু উৎসবের সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রতিটি পূর্ণিমাকে ভালো করে পর্যবেক্ষণের সুযোগ যার হয়েছে সে অনায়াসে বুঝবে কার্তিক পূর্ণিমায় চাঁদের বাহার অন্য পূর্ণিমার থেকে অনেক বেশি।' বর্ষার ঘনঘটা নেই, শীতের কুয়াশায় চারদিক আচ্ছাদিত। এই সময় মিঠে আলো দেওয়া চাঁদ খুবই মনোহর। রাত যত গভীর হয় ততই স্তব্ধতা বৃদ্ধি পায় সেই চাঁদের আলোয় রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহকে মন্দিরের বাইরে নিয়ে আসা হয়। আগে থেকে তৈরি করে রাখা হয় রাসমঞ্চ। কোনও কোনও মন্দিরে পৃথক রাসমঞ্চ নির্মাণ করা থাকে। সেই রাসমঞ্চ ফুল-পাতা ও আলো দিয়ে সাজানো হয়। রাধা-কৃষ্ণের মনোহর মূর্তির পাশে থাকেন শ্রীরাধিকার অষ্টসখী আর একটি তুলসী মঞ্জরী। সেই মঞ্চের চারপাশে গোপী ও কৃষ্ণের নৃত্যরত মূর্তি সাজানো থাকে। সমস্ত জায়গায় কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা-কাহিনিকে মূর্তি দিয়ে সাজানো হয়। যেমন পূতনা বধ, ননীচুরি, গোবর্ধন ধারণ ইত্যাদি রাস উপলক্ষ্যে মন্দিরপ্রাঙ্গণে মেলা বসে। আর বৈষ্ণব আখড়াগুলিতে বাঁশি বেজে ওঠে, তার সঙ্গে মৃদঙ্গ আর খঞ্জনির সঙ্গতে পরিবেশ রসমণ্ডিত হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবীর কণ্ঠে বাজে কৃষ্ণলীলা মাধুরী মেশানো গীতধারা— সব নিয়ে একটি মধুর উৎসব রাস।

সমগ্র ভারতের মধ্যে মণিপুর অঞ্চলে রাস একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মণিপুরের রাজা ভাগ্যচন্দ্র এই রাস উৎসবের প্রচলন করেন। কথিত, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এই উৎসবের সূচনা করেন। নিজের কন্যাকে রাধা ও মন্দিরের কৃষ্ণকে নিয়ে রাসনৃত্য সৃষ্টি করেন। তিনি নিজে ছিলেন মৃদঙ্গবাদক। শোনা যায় ওই তালবাদ্য তিনি স্বপ্নেই পেয়েছিলেন। এই রাসনৃত্য পাঁচভাগে বিভক্ত— মহারাস, বসন্তরাস, কুঞ্জরাস, দিব্যরাস ও নিত্যরাস। বঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের জন্মস্থান নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে রাস উৎসব অত্যন্ত জমকালোভাবে পালিত হয়।

সেই কবে, কোন যুগে কৃষ্ণ অনঙ্গ আহ্বানে বংশীধ্বনিতে বৃন্দাবন মুখরিত করেছিলেন, আজও সেই বাঁশি বেজে চলেছে। ভক্তহৃদয়কে আপ্লুত করে আকর্ষণ করে সৃষ্টি করছে নিত্যনতুন ভক্ত— ভগবানের লীলাখেলা। এ রাসনৃত্য, ভক্তের ভগবানে মিলিত হওয়ার যাত্রা। তাই রাসযাত্রা।

তথ্যসূত্র :

১. 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা'-কুশল বরণ চক্রবর্তী।
২. 'রাসযাত্রা, তত্ত্বে ও কাহিনিতে'-পূর্বা সেনগুপ্ত।

জাতিকে সিংহবিক্রমে উদ্বুদ্ধ করেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ

শিবাজী প্রসাদ মণ্ডল

বিদেশি বিধর্মী মুঘলদের শাসনে যখন ভারতবর্ষে ধর্ম, সংস্কৃতি ভীষণভাবে বিপন্ন, তখন ধর্মরক্ষাকারী রূপে অবতীর্ণ হন গুরুগোবিন্দ সিংহ। একদিকে দিল্লির সিংহাসনে আসীন ঔরঙ্গজেবের সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ও অত্যাচারে হিন্দুসমাজ ভীত, সন্ত্রস্ত; অন্যদিকে জাতপাত, কুপ্রথা, অন্ধবিশ্বাসে হিন্দু সমাজ বহুধাবিভক্ত, অসংগঠিত। তৎকালীন হিন্দু নেতৃত্ব সমাজকে সংগঠিত ও জাগ্রত করে ধর্ম-সংস্কৃতিকে রক্ষা করার বদলে ভাগ্যের উপর সব ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ঘনান্ধকারময় সময়ে 'হিন্দু কী হিম্মত' হয়ে সমাজকে সংগ্রামমুখী করে তুলেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিংহ।

শিখগুরু পরম্পরার দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জন্ম বিহারের পাটনা শহরে ১৬৬৬ সালের ২২ ডিসেম্বর হয়। পিতা নবম গুরু তেগবাহাদুর এবং মাতা গুজরীদেবী। শিশুকালেই তারা সপরিবারে পাটনা থেকে পঞ্জাবে চলে যান। উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা হয়; পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও রপ্ত করতে থাকেন। ছোটো থেকেই একটা বীরভাব তাঁর মধ্যে ছিল যা পরবর্তীকালে ধর্মরক্ষায় সহায়ক হয়।

গুরু গোবিন্দ সিংহের সাহস, দৃঢ়তা, নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা বাল্যকালেই দেখা গিয়েছিল। যখন ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে কাশ্মীরের হিন্দুদের ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবন বিপন্ন; তাঁদের ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হচ্ছে তখন কাশ্মীরের একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কৃপারামের নেতৃত্বে তেগবাহাদুরের কাছে আসেন এবং বলেন যে, ঔরঙ্গজেব জোর করে অত্যাচার করে তাদের মুসলমান করতে চাইছে। কৃপা করে তিনি যেন তাদের ধর্ম ও জীবন রক্ষা করেন। এমতাবস্থায় গুরু তেগবাহাদুর অনেক ভাবনাচিন্তা করে বলেন, এই ধর্মান্ধতা বন্ধ করে জীবন ও ধর্মরক্ষা করার জন্য একজন মহাপুরুষকে জীবন বলি দিতে হবে। পাশে দণ্ডায়মান বালক গোবিন্দ রায় পিতাকে বলেন, বর্তমান সময়ে আপনার মতো মহাপুরুষ আর কে আছেন? পুত্রের এই কথা শোনার পর গুরু তেগবাহাদুর আনন্দে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং চিন্তামুক্ত হন এই ভেবে যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এই পুত্রই গুরু পরম্পরা যথার্থভাবে নির্বাহ করতে পারবে। এরপর গুরু তেগবাহাদুর আগত পণ্ডিতদের বলেন তারা যেন ঔরঙ্গজেবকে গিয়ে বলে তাদের গুরুদেব তেগবাহাদুরকে ধর্মান্তরিত করতে পারলে তারা মুসলমান হয়ে যাবে।

এর পরের ইতিহাস আমাদের সকলের জানা। বালকপুত্র গোবিন্দ রায়কে গুরুপদে অভিসিক্ত করে গুরু তেগবাহাদুর তাঁর দুই শিষ্য— ভাই মতিদাস ও ভাই সতীদাসকে নিয়ে আগ্রার দরবারে উপস্থিত হন। ধর্মান্তরণের জন্য নানান ভীতি প্রদর্শন তাঁদের টলাতে পারেনি। গুরু তেগবাহাদুরের সামনে তাঁর দুই শিষ্যকে অত্যন্ত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই দৃশ্য তাঁর সাহস ও দৃঢ়তায় কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারেনি; তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন--- 'মাথা দেব কিন্তু ধর্ম দেব না।' পরিণামে গুরু তেগবাহাদুরের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়।

ধর্মের জন্য পিতার এই বলিদান গুরু গোবিন্দ সিংহকে ভীষণভাবে ভাবিয়ে তোলে। কীভাবে হিন্দু সমাজ, সংস্কৃতি রক্ষা পায় তা নিয়ে তিনি গভীর চিন্তন শুরু করেন। জাতির দুর্বলতা ভীরুতা, কারুপুরুষতা কাটিয়ে তাকে বীরত্ব, পুরুষত্বে উজ্জীবিত করতে হবে। মৃত্যুভয় কাটিয়ে সমাজ যদি ধর্মের জন্য জীবন দিতে পারে তবেই দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। তার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন সমাজের সামরিকীকরণ; শাস্ত্রের সঙ্গে শস্ত্রের শিক্ষা। সর্বত্র নিমন্ত্রণপত্র ও আদেশনামা প্রেরণ করা হলো। সমগ্র দেশ থেকে হাজার হাজার শিষ্য আনন্দপুরে জমায়েত হতে লাগলো। ১৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখী উৎসবের দিন কেসগড়ে (আনন্দপুরের দুর্গ) চন্দ্রাতপ খাটিয়ে তার মধ্যে এক সুন্দর মঞ্চ প্রস্তুত করা হলো। ভজন, কীর্তনের পর দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ এক অদ্ভুত

ঘটনার অবতারণা করলেন। নিজে রণসাজে সজ্জিত হয়ে হাতে খোলা তরবারি নিয়ে বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি বর্ণনা করে আহ্বান করলেন দেশ, ধর্ম, সংস্কৃতি রক্ষার জন্য জীবন বলিদান চাই; কে আছো জীবন দেবে এগিয়ে এসো। প্রথমে এক অদ্ভুত নীরবতা দেখা গেল। কেউ বুঝতে পারছে না গুরুদেব কী করতে চাইছেন। কিন্তু বার বার তাঁর গর্জনে ও আহ্বানে একটা হইচই পড়ে গেল।

প্রথমে ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে এগিয়ে এলেন লাহোরের দয়ারাম খত্রী; গুরুদেব তাঁকে পাশের কক্ষে নিয়ে গেলেন, ভেতরে একটা আর্ত চিৎকারে সবাই ভীত ত্রস্ত। পাশের নালাপথ দিয়ে রক্তধারা প্রবাহিত। এরপর গুরুগোবিন্দ সিংহ রক্তমাখা তরবারি নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আরও মাথা চাই। কে আছো, যে ধর্মের জন্য জীবন দেবে?

এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি হস্তিনাপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কবি ধর্মদাস করজোড়ে গুরুজীর সামনে উপস্থিত হলেন। গুরুজী তাকেও পাশের কক্ষে নিয়ে গেলেন, একই রকম আর্ত চিৎকার, নালাপথে রক্তের ধারা। গুরুজী আবার সবার সামনে ফিরে এলেন এবং জীবন দানের জন্য আবার আহ্বান করলেন। অনেক মাথা চাই, আরও মাথা চাই— এরপর একে একে মাথা দিতে এগিয়ে এলেন দ্বারকা থেকে আগত ধোপা মোহকমচন্দ, কর্ণাটকের বিদর থেকে নাপিত সাহেবচন্দ এবং সবশেষে ওড়িশার পুরীধাম থেকে (জলবাহক) আগত হিম্মত রায়। গুরুজীর যে আহ্বান ছিল— 'হ্যায় কই শিখ বেটা, জো করে শীশ ভেটা'। এতে সাড়া দিয়ে পরপর পাঁচজন যাঁরা জীবন দিতে এগিয়ে এলেন, তাঁদের সবার সামনে আনা হলো। বলিদান হয়নি, বলিদানের অভিনয় করা হয়েছিল। এই পাঁচজনকে বলা হলো— 'পঞ্চ প্যারে'; তাঁদের মাথায় নতুন গৈরিক পাগড়ি পরিয়ে, অমৃতপান করানো হয়। গঠন করা হয় খালসাপন্থ। গুরুজী বললেন এই পাঁচজন প্রিয় শিষ্যের নেতৃত্বেই বিশাল খালসা বাহিনী ধর্মের জন্য লড়াই করবে এবং এদের ইচ্ছাই প্রত্যেকের কাছে আজ্ঞাস্বরূপ। আজ থেকে প্রত্যেক শিখ 'সিংহ' পদবি গ্রহণ করবে, প্রত্যেকেই হবে বীর যোদ্ধা। ওইদিন থেকেই খালসাদের জন্য— পঞ্চ 'ক' অর্থাৎ কেশ, কৃপাণ, কঙ্ঘা, কচ্ছা, কড়া— এই পাঁচটির ব্যবহার অনিবার্য হয়।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক কানিংহাম লিখেছেন— 'শিখদের দশম গুরু পরাধীন জাতির সুপ্ত শক্তি জাগ্রত ও বিকশিত করে সামাজিক স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অস্মিতায় পূর্ণ করেন। এসবই ছিল গুরু নানকদেব প্রবর্তিত ভক্তিভাবের ধারা। বস্তুত গুরু গোবিন্দ সিংহ ছিলেন ত্যাগ, বলিদান, প্রেম, বীরত্বের মূর্তিমান প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন জাতির মধ্যে সামরিকভাব জাগ্রত হোক। তাই সমাজকে এক অপূর্ব বিজয়গাথা প্রদান করেন—

'দেহ শিবা বরু মোহি ইহৈ
শুভ করমন তে কবহুঁ ন টরৌঁ
ন ডরৌঁ অরি সৌঁ জব জাই লরৌঁ
নিশ্চয় কর অপনী জীত করৌঁ।' (দশম গ্রন্থ)

অর্থাৎ, 'হে শিবশম্ভো! এই আশীর্বাদ কর প্রভু, মহৎযোগে যেন পিছিয়ে না পড়ি কভু। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসমরে না আসে যেন মনে ভয়। জয়লাভে যেন আমি থাকি দৃঢ়নিশ্চয়।' গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সমাজকে শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তৈরি করেছেন তা নয়, সেই সঙ্গে সবাই যাতে ধর্মরক্ষায় আত্মবলিদানের জন্য প্রস্তুত হয় তারও চেষ্টা করেছেন।

গুরু গোবিন্দ সিংহের মন্ত্রে শিখ সমাজ কতটা জেগে উঠেছিল, কতটা নির্ভীক হয়েছিল তার বহু উদাহরণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। গুরু গোবিন্দের নয় ও ছয় বছরের পুত্র জোরাবর সিংহ ও ফতেহ্ সিংহকে ঠাকুমা গুজরীবাঈ শত্রুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরছিলেন। সেখান থেকে তাঁদের বন্দি করে সরহিন্দের দুর্গে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরের জন্য ভীতি প্রদর্শন করা হচ্ছিল, কিন্তু কোনোপ্রকার ভয় ও চাপের কাছে নতিস্বীকার না করায়, কাজির নির্দেশে দুই ভাইকে জীবন্ত দেওয়ালে গেঁথে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। অত্যন্ত শান্ত ও নির্ভীকভাবে দুই ভাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেনি। গুরু গোবিন্দ সিংহের একটি কথা তাঁদের আত্মবিশ্বাসে ভরিয়ে দিত— 'সোওয়া লাখ সে এক লড়াউঁ, চিড়িয়ন তে ম্যাঁয় বাজ তুড়াউঁ, তবৈ গুরু গোবিন্দ সিংহ নাম কহাউঁ।' তাঁর প্রেরণায় হিন্দুধর্মের শিখ পন্থাবলম্বী ক্ষত্রিয়কুল রণাঙ্গনে যেমন বীর বিক্রমে লড়েছে, আবার হাসতে হাসতে আত্মবলিদানও দিয়েছে। তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটার পরও 'ওয়াহে গুরুজী কী ফতে' স্মরণ করে শান্ত থেকেছে। শুধু তাই নয়, মায়েদের মুঘল সেনারা বন্দি করে জেলে নিয়ে গিয়ে সোয়া মন করে গম ভাঙ্গার জন্য বাধ্য করে আর তাদের কোলের শিশু কেড়ে নিয়ে কখনো শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে বর্শায় গেঁথে ফেলে, কখনও-বা শিশুদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরো টুকরো করে কেটে তা দিয়ে মালা তৈরি করে মায়েদের গলায় পরিয়ে দেয় তখনও তারা গুরুজীর নাম স্মরণ করে শান্ত থেকেছে। এই শক্ত মনোভাবের কারণে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত, মুঘল থেকে ইংরেজ-সহ সব বিদেশি, বিধর্মীদের শাসন থেকে দেশমাতাকে মুক্ত করে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্জাব তথা শিখ পন্থাবলম্বীদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'শিখ' শব্দের অর্থ 'শিষ্য'। শাস্ত্রই চালিত করে শস্ত্রকে; শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারাই প্রথমে মনোজগতে ভাবের সঞ্চার হয়। এই ভাব শরীর-মনকে সংগ্রামমুখী করে তোলে। প্রাচীন সংস্কৃত রচনার ভাবধারা নিয়ে গুরুজী শিখ-খালসাদের মধ্যে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটাতে চেয়েছিলেন। বিদ্বান বা কবিদের দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থগুলির অনুবাদ করে লোকভাষাতে, যাতে তা সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া যায় তার চেষ্টা করেছিলেন। পাঁচজন শিখকে বিধিবদ্ধভাবে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য গুরু গোবিন্দ সিংহ কাশী প্রেরণ করেন। এই পাঁচজন হলেন যথাক্রমে করম সিংহ, গণ্ডা সিংহ, বীর সিংহ, সাইনা সিংহ ও রাম সিংহ। এদের তিনি ব্রহ্মচারী বেশ ধারণের আদেশ দেন। তাই আজও নির্মলপন্থী সন্তগণ ব্রহ্মচারী পরম্পরার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; গুরুবাণী ও বেদবাণীতে বিদ্বান নির্মল পরম্পরার উপর শিখপন্থ প্রচারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

জাতির আত্মবলিদান ও স্বজাত্যপ্রেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বার বার গুরু গোবিন্দ সিংহের কথা বলতেন। লাহোরে ধ্যান সিংহের হাভেলিতে এক ভাষণে তিনি বলেন— 'হে পঞ্চনদের সন্তানগণ, এখানেই আমাদের জাতির শেষ এবং মহামহিমান্বিত বীরগণের অন্যতম গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ধর্মের জন্য নিজের এবং নিজ-প্রাণসম প্রিয়তম আত্মীয়বর্গের রক্তপাত করিয়াছিলেন, ...আমার বাক্য অবধান কর— যদি তোমরা দেশের হিতসাধন করিতে চাও, তোমাদেরও প্রত্যেককে এক এক জন গুরু গোবিন্দ সিংহ হইতে হইবে।' *(স্বামীজীর বাণী ও রচনা, পঞ্চম খণ্ড)।*

শিখপন্থ : স্বামী বিবেকানন্দের অনুভব

কল্যাণ গৌতম

অহিন্দুর আক্রমণের বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়কে বিরোধ ভুলে একত্রিত হতে হবে। হাজার রকমের দোষ থাকলেও যাদের মধ্যে 'হিন্দুরক্ত' আছে, প্রেমের বাণী প্রয়োগ করে একত্রিত করতে হবে। বহুধা বিদীর্ণ ধর্মীয় মতবাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনের অনন্য প্রয়াসে হাত বাড়িয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

নানক তাঁর সময়ে হিন্দুত্ব ছেড়ে ইসলাম মত গ্রহণে স্বয়ং বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। লাহোরে স্বামীজী বললেন, 'এখানেই সেই মহাত্মা তাঁর প্রশস্ত হৃদয়ের দ্বার খুলে এবং বাহু প্রসারিত করে সমগ্র জগৎকে— শুধু হিন্দুকে নয়, মুসলমানদেরও পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে ছুটে গিয়েছিলেন।' কথাটির মধ্যে ধর্মান্তরণ রোধ করার বার্তা আছে, আছে ধর্মান্তরিত হিন্দুদের কাছে পুনরায় আপন ধর্মে ফিরে আসার বার্তা।

স্বামীজীর লাহোর বক্তৃতায় পাওয়া যায়, 'এই সেই বীরভূমি— যা যতবার এই দেশ অসভ্য বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে, ততবারই বুক পেতে প্রথমে সেই আক্রমণ সহ্য করেছে।' দৃষ্টান্ত হিসাবে মহান গুরু গোবিন্দ সিংহের নাম উচ্চারণ করলেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন।

দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে এবং হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য রক্তদানের কথা বলেছেন স্বামীজী। বলেছেন গুরু গোবিন্দ সিংহ একজন যোগ্য হিন্দু। স্বামীজীর উক্তি, 'এই মহাত্মা দেশের শত্রুগণের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য নিজের শোণিতপাত করলেন, নিজের সন্তানদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করতে দেখলেন। ...যদি আমরা দেশের হিতসাধন করতে চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই এক একজন গোবিন্দ সিংহ হতে হবে। ...আমাদের মধ্যে যিনি এমনি করতে পারবেন তিনিই হবেন হিন্দু নামের যোগ্য। আমাদের সামনে সর্বদাই এই রকম আদর্শ থাকা প্রয়োজন। পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ভুলে গিয়ে চারিদিকে প্রেমের প্রবাহ বিস্তার করতে হবে।'

স্বামীজী লাহোরে ধ্যান সিংহ হাভেলিতে ১৮৯৭ সালে বক্তৃতা দেন, 'আমাদের মধ্যে কী কী বিভিন্নতা আছে তা প্রকাশ করবার জন্যে আমি এখানে আসিনি। এসেছি আমাদের মিলনভূমি কোথায় তা অন্বেষণ করতে। কোন ভিত্তি অবলম্বন করে আমরা চিরকাল সৌভ্রাত্রসূত্রে আবদ্ধ থাকতে পারি। তিনি গুরু নানক এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের মহত্ত্ব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুধর্মের অন্যান্য সম্প্রদায়ের একত্ব ও মিলনের সূত্র বললেন।

নানক, কবীর, শ্রীচৈতন্যের মতো মহাত্মাদের আবির্ভাব কেন গুরুত্বপূর্ণ— তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'যদি তাঁহারা এই শিক্ষা প্রচার না করিতেন, তাহা হইলে উত্তর ভারতে আরও অনেক লোকে নিশ্চয় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিত।' একদা হিন্দু-শিখকে কাছাকাছি এনে ফেলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এর প্রভাব স্বামী বিবেকানন্দের উপরও পড়েছিল। সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক- ধর্মীয় পরিবেশে এই সমন্বয় না হলে আরও হিন্দু ধর্মান্তরিত হতেন এবং হিন্দুদের উপর নেমে আসতো আরও ভয়ংকর আক্রমণ। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা যুগাচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন, 'গুরু গোবিন্দ কোন আদর্শে খালসা শিখ গড়েছিলেন? গুরুর আদেশে সর্বস্ব ত্যাগে, জীবন ত্যাগে আগ্রহান্বিত থাকবে— এই ছিল তাঁর প্রেরণা ও শিক্ষা। তাইতো মারহাট্টা ও শিখ জাতি দুর্জয় হয়ে উঠেছিল।'

শিখপন্থা হিন্দুত্বের বৃহত্তর আধার ছাড়া আর কিছু নয়। বিধর্মীরা ধর্মপ্রচারের স্বার্থে বুঝিয়ে গেছে; বামেস্লামিক সেকুলার শক্তি বুঝিয়ে গেছে— তুমি বৌদ্ধ তুমি আলাদা; তুমি জৈন, তুমি হিন্দু নও; তুমি তপশিলি জাতি, তুমি আলাদা; তুমি তপশিলি উপজাতি, তুমিও ভিন্ন; তুমি ওবিসি, কাজেই আলাদা। হিন্দুত্বকে দুর্বল করার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে কাজ করে চলেছে ধর্মান্তরণের কারিগরেরা। তাই বুঝতে হবে কোথায় আমাদের মিল, কোথায় বৌদ্ধ-হিন্দু মিলনসূত্র, কোথায় শিখ-হিন্দু অভিন্ন, কোথায় জৈনতে-হিন্দুতে একাকার।

স্বামীজী একদা বলেছিলেন, সমগ্র বিশ্বে একটি ধর্ম কখনই থাকতে পারে না। বলেছিলেন, কোনো ধর্মকেই ঘৃণা করা উচিত নয়। তিনিই শিয়ালকোটে 'ভক্তি' বিষয়ক বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন, 'যে ধর্ম অন্যায় কাজের পোষকতা করে সেই ধর্মের প্রতিও কি সম্মান দেখাতে হবে?... এই সব ধর্ম যত শীঘ্র দূরীভূত করা যায় ততই মঙ্গল। কারণ ওই ধর্মের দ্বারা লোকের অকল্যাণই হয়ে থাকে।'

স্বামীজীর মতে, 'বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বারবার আমাদের এই জাতির মস্তিষ্কের ওপর দিয়ে চলে গেছে। শত শত বছর ধরে 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছে। আর সেই সময় এমন কোনো হিন্দু ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের বিনাশের আশঙ্কা করেনি।' শিখপন্থার মানুষের কাছে স্বামীজীর বার্তা ছিল, 'যদি পারি তাহলে আমাদের পরস্পরের মিলনভূমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করব। যদি ঈশ্বরের কৃপায় এটা সম্ভব হয় তাহলে ওই তত্ত্ব কাজে পরিণত করতে হবে।' শিখ-হিন্দু সমন্বয়ের কাজটি ত্বরান্বিত করতে গুরু নানকের আবির্ভাব দিবস উদ্‌যাপন এক অনন্য কৃত্য। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ— বিশ্বের এই তিনটি পন্থার উৎসভূমি ভারতবর্ষ। আলাদা ধর্ম বলা হলেও তা আদতে হিন্দু ধর্মের কুসুমোদ্যানে প্রস্ফুটিত পৃথক ফুল— সেই শাশ্বত সত্যটি প্রকাশ করাই বর্তমানে জরুরি হয়ে পড়েছে। গুরু নানকের জন্মদিন উদ্‌যাপন তারই ভাবনায় অন্বিত।

তথ্যসূত্র :

১. স্বামীজীর শিয়ালকোটে প্রদত্ত বক্তৃতা, বিষয়— ভক্তি; সূত্র : বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র অখণ্ড বাংলা সংস্করণ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৭৬৮। ২. লাহোরে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতা, বিষয় : হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি, তথ্যসূত্র : ঐ, পৃষ্ঠা : ৭৭১। ৩. শ্রীশ্রীযুগাচার্য জীবন-চরিত, স্বামী বেদানন্দ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৪২৬, পৃষ্ঠা : ২৮৩।

আরশোলা সিদ্ধ করে হাঁপানির ওষুধ

হীরক কর

ছেলেবেলায় তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ‘বর্ণপরিচয়ের স্রষ্টা’ হিসেবে। তিনি পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক। দানবীর, দয়ার সাগরও বটে। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এমনই এক মহামানব, যিনি সমাজের অনেক কুপ্রথাকে আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে সমাজকে করে তুলেছেন নারী ও শিশুদের উপযোগী। সমাজকে দেখিয়েছেন আলোর দিশা। করেছেন কলঙ্কমুক্ত। শিক্ষার আলোতে দিয়েছেন গুঁড়িয়ে কুপ্রথার বেড়াজাল। আধুনিকতায় উত্তীর্ণ করেছেন দেশকে।

উনিশ শতকের বঙ্গদেশের অন্যতম ঋজু মানুষ তিনি। ব্যক্তিজীবনে ছিলেন খুবই বিনয়ী নম্র, ভদ্র ও দৃঢ়চেতা মানুষ। তিনি যদি কোনো বিষয়ে সংকল্প করতেন, তাঁর লক্ষ্য তিনি পূরণ করবেনই। সেটা তিনি করেই ছাড়তেন। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ এসব তিনি বন্ধ করান। পাশাপাশি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ এবং নারী ও শিশু শিক্ষার জন্য তিনি আজীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৬ সালে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ আইন তিনি পাশ করিয়ে ছেড়েছিলেন।

বাংলাভাষায় ও সংস্কৃতভাষায় তিনি একাধিক বই রচনা করেছেন। এছাড়াও তাঁর বেশ কিছু অনুবাদ গ্রন্থও রয়েছে। শিশুপাঠ্য বর্ণপরিচয় রচনা করেছেন। বাংলা গদ্যে তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বাংলা গদ্যের প্রথম লিপিকার হিসেবেও অভিহিত করেছেন। আজও বাঙ্গালি জীবনের মিথ হয়ে আছে তাঁর বিদ্যার্জনের গল্প, মায়ের ডাকে সাঁতারে নদী পার হওয়ার কাহিনি।

বিদ্যাসাগরের দীর্ঘমেয়াদী হাঁপানি রোগ ছিল। শীতকালে সেই রোগ বেড়ে যেত। তিনি সকালে সন্ধ্যায় দু’বেলা গরম চা পান করতেন। একদিন চা খাওয়ার পর অনুভব করলেন হাঁপানির টান যেন একটু বেশি মাত্রায় কম বোধ হচ্ছে। ভৃত্যকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন চায়ে আদা বা বিশেষ কিছু দেওয়া হয়েছিল কিনা। ভৃত্য বলে, না রোজ যেভাবে বানাই, সেভাবেই বানিয়েছি। বিদ্যাসাগরের সন্দেহ হয়। সরেজমিনে বিষয়টা খতিয়ে দেখতে রান্নাঘরে গিয়ে চায়ের কেটলি খোলেন তিনি। যা দেখেন তাতে হতভম্ব বিদ্যাসাগর। কেটলিতে দুটো আরশোলা মরে পড়ে আছে।

ভুবনকৃষ্ণ মিত্র লিখছেন, ‘তিনি দেখিলেন এক কেটলি জলে যখন ২টা আরশোলা পড়িয়া তাঁহার হাঁপ অর্ধেক কমাইয়াছে, তখন বলিলেন, না জানি বহু পরিমাণে উহা জলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে অ্যালকোহলে ফেলিয়া ছাঁকিয়া, হোমিওপ্যাথি মতে ঔষধ বানাইয়া লোকের বা রোগীর অজ্ঞাতে সেবন করাইয়া এবং নিজেও ব্যবহার করিয়া দেখিব, হাঁপ কাশি সারে কি না?’ যেমন ভাবা তেমন কাজ। হোমিওপ্যাথি মতে ওই ওষুধ তৈরি করে অনেকের কষ্ট উপশম করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

চালচলনে, পোশাকআশাকে কোনও বাহুল্য ছিল না ঈশ্বরচন্দ্রের। একেবারে টোলের পণ্ডিতের মতো জীবন কাটাতেন। সময়টা ইংরেজ আমল। হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল তখন ওয়াল্টার স্কট সেটন কার। কী এক প্রয়োজনে একদিন কার সাহেবের অফিসে আসেন বিদ্যাসাগর। নিজের টেবিলে তখন পা তুলে বসে আছেন কার সাহেব।

বিদ্যাসাগরকে দেখেও সেই জুতোশুদ্ধ পা নামানোর সৌজন্যটুকুও দেখালেন না। সেদিনকার মতো কাজ মিটল বটে, কিন্তু এই অসৌজন্য ভুললেন না বিদ্যাসাগর। এর বেশ কিছুদিন পর কাজের দরকারে বিদ্যাসাগরের অফিসে এসেছেন কার সাহেব। দরজা খুলে তো তিনি অবাক। টেবিলের ওপরে পা তুলে বসে আছেন বিদ্যাসাগর। আর তাঁর খড়মশুদ্ধ পা দুটো টেবিলের ওপর ঠিক কার সাহেবের মুখোমুখি। সেদিন ওভাবেই সাহেবকে অপমানের জবাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন ঋজু শিরদাঁড়ার মানুষটা।

এক ভদ্রলোক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিন্দা করছেন বিদ্যাসাগরের কাছে। তিনি বঙ্কিমের চরিত্র সম্পর্কে খারাপ কথা বলছেন। বলছেন কী কদর্যভাবে রাত কাটান বঙ্কিম। ইঙ্গিত খুব নোংরা। এসব শুনে বিদ্যাসাগর বললেন বলো কী? সারাদিন এত বড়ো সরকারি দায়িত্ব পালন করেও এভাবে রাত কাটায়, তাহলে লেখে কখন! আমার তো একটা শেলফ তাঁর বইয়ে ভরে গেল। যাই বল তোমার কথা শুনে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আমার বেড়ে গেল।

সুবলচন্দ্র মিত্রের বইয়ে বিদ্যাসাগরকে লেখা কবি মধুসূদনের একটি দুর্লভ চিঠি পাওয়া যায়। মুধুসূদন লিখছেন, 'আমার সহকর্মী বাবু মূর্তিলাল চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তোমার কাছে যাব। তুমি এক বোতল শেরি আনিয়ে রেখো'। বিদ্যাসাগরের কাছে মদ আনিয়ে রাখার বায়না মুধুসূদন ছাড়া কেউই-বা করতে পারতেন।

১৮৭৪-এর ২৮ জানুয়ারি। এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য বিদ্যাসাগর। সেই উপলক্ষ্যেই সোসাইটিতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাধা দিল দ্বাররক্ষী। চটি পরে ভিতরে যাওয়া যাবে না। বুট পরলে অবশ্য অসুবিধা ছিল না, কিন্তু চটি ফটফটিয়ে সোসাইটির ভিতর, নট অ্যালাওড্। হয় চটি বাইরে খুলে যান, নাহলে খালি পায়, হাতে চটি নিয়েও যেতে পারেন। স্বভাবতই অপমানিত স্বাভিমানী বিদ্যাসাগর। দরজা থেকেই ফিরে গেলেন। শোনা যায়, ফিরে যাওয়ার সময় তাৎক্ষণিক একটি শ্লোক বানিয়ে আওড়াতে আওড়াতে বেরিয়ে আসেন সেখান থেকে। শ্লোকটি হলো, 'বিদ্বত্বঞ্চ জুতত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।/স্বদেশে পূজ্যতে বিদ্যা, জুতা সর্বত্র পূজ্যতে'। অর্থাৎ বিদ্রূপাত্মক এই শ্লোকটি বলছে, বিদ্বান আর জুতোর কোনও তুলনা হয় না। বিদ্যার কদর কেবল স্বদেশে আর জুতোর জয়জয়কার সর্বত্র।

বাড়িতে ফিরেই কড়া করে চিঠি লিখলেন কর্তৃপক্ষকে। ইংরেজি সেই চিঠি বাংলায় তর্জমা করলে দাঁড়ায় খানিকটা এই রকম— 'ইংরেজি প্যাটার্নের শু পরে দিব্য ঢোকা যাচ্ছে, আর দেশীয় চটিতে নয়!' বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন অতি 'নিরীহ'। জীবনে একই পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি একই পরিস্থিতিতে সোসাইটিতে ঢুকতে বাধা পাচ্ছেন, কেবল মাত্র দেশীয় পাদুকা পরিধানের জন্য। আমি এর কোনও কারণ দেখতে পাচ্ছি না'। তাঁর লড়াই ছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। আজও দেশীয় পরিধান দেখে শপিং মল, ক্লাব বা রেস্তোরাঁয় আমাদের ঢুকতে বাধা দেয় আমাদেরই স্বজাতীয় ভারতীয়। কলোনিয়ালিজমের কিছু প্রোথিত অভ্যাস যে ভারতীয় মানবাত্মাকে কলুষিত করে চলেছে, এমনকী সুদূর ভবিষ্যতেও, তা কি এই মহামানব সেই ১৮৭৪-এই বুঝতে পেরেছিলেন?

ঈশ্বরচন্দ্রের মা ভগবতী দেবী সেই কুরীতি, কুপ্রথার যুগেও ছিলেন আধুনিক চিন্তার অধিকারিণী। বিদ্যাসাগর তাঁর মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করতেন। তিনি অকাতরে মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতেন। গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়গুলো মায়ের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শোনা যায়, মায়ের কাছ থেকে ছোটো ভাইয়ের বিয়ের চিঠি পেয়ে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবের কাছ থেকে ছুটি চাইলেন বাড়ি যাবার জন্য। ইংরেজ অধ্যক্ষ ছুটি দিতে না চাইলে তিনি চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন মাতৃ আদেশ অমান্য করা অসম্ভব বলে। পরে ছুটি পেলে রাতে বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথে উন্মত্ত দামোদর নদী, আবহাওয়া খারাপ থাকায় নদী পারাপারের জন্য কোনো নৌকা পাওয়া গেল না। তখন তিনি নদী সাঁতরে বাড়িতে এসে পৌঁছালেন। এমনই ছিল তার মাতৃভক্তি।

মাতৃভক্তি ছিল তার চরিত্রের অন্যতম গুণ। মনে করা হয়, বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও মুক্তচেতনার নেপথ্যে জননী ভগবতী দেবীর বিশেষ প্রেরণা ছিল। বীরসিংহ গ্রামে তিনি মায়ের নির্দেশে বিদ্যালয়, অবৈতনিক ছাত্রাবাস ইত্যাদি গড়েছিলেন। তাঁর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনেও এই গ্রাম্য মহিলার বিশেষ অবদান ছিল।

বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন মোটেই সুখে কাটেনি। জ্যেষ্ঠ সন্তান একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৭২ সালে তাঁকে ত্যাজ্য ঘোষণা করেন। কিছু দিন পরেই মারা যান স্ত্রী দীনময়ী দেবী। নিঃসঙ্গ বিদ্যাসাগর একটু নির্জনতার জন্য বড়োই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। এরপর থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। আবহাওয়া পরিবর্তন করার প্রয়াসে তিনি ঝাড়খণ্ডে কার্মাটাঁড়ে সুন্দর ও ছিমছাম একটি বাড়ি কেনেন। কার্মাটাঁড় জায়গাটি ছিল সাঁওতাল প্রধান। তাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হয়ে বিদ্যাসাগর বাকি জীবনটা সেখানেই কাটাবেন স্থির করেছিলেন। শান্তির খোঁজে কার্মাটাঁড়ে স্টেশনের কাছে পাঁচশো টাকায় স্থানীয় এক ইংরেজ মহিলার কাছ থেকে আমবাগান সমেত প্রায় ১৪ বিঘা জায়গা কেনেন। স্বামী মারা যাওয়ার পর সেই জমি তিনি বিদ্যাসাগরকে বিক্রি করে চলে যান। এখানেই একটি ছোটো বাড়ি তৈরি করেন বিদ্যাসাগর। নাম দেন নন্দনকানন। রাতের স্কুল চালানোর জন্য মাঝখানে একটি হলঘর, একপাশে শোবার ঘর, অন্যপাশে পড়ার ঘর। বাড়িতে ঢোকার ডান দিকে নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন একটি কিষাণভোগ আমগাছও। বাগানের দেখভালের জন্য কালী মণ্ডল নামে এক মালিও ছিল তাঁর। কালীকে দিয়ে বাগানের শেষ প্রান্তে লাগিয়েছিলেন একটি ভাগলপুরি ল্যাংড়া আমগাছ। কার্মাটাঁড়ে বসেই তিনি 'সীতার বনবাস', 'বর্ণপরিচয়'-এর তৃতীয় সংস্করণের প্রুফ দেখেছেন।

১৮৯১ সালে স্থায়ী ভাবে চলে আসেন কলকাতার বাদুড়বাগানের বাড়িতে। শারীরিক যন্ত্রণা তখন প্রবল। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেন ব্যথা, প্রকাশ অতটা করেন না। ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই নারী-বান্ধব, সমাজের অগ্রদূত, প্রাতঃস্মরণীয় এই মহাগুণী, মহা পণ্ডিত কলকাতাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK
Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.
74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0550. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন
মিউচুয়াল ফান্ডে
SIP করুন
(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)
কি জন্য করবেন?

★ RETIREMENT PLANNING.
★ CHILDREN EDUCATION FUND.
★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
★ WEALTH CREATION.
★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT
8240685206
9748978406
Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com
PMS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond
ডোমজুড় বিসনস প্লাজা (পোষ্ট অফিসের নিকেটে), ৩য় তল, ডোমজুড়, হাওড়া।
মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

ভারতে বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার

সন্দীপ কুমার সিন্‌হা

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন বিজ্ঞান সাধক ও চিকিৎসক। তিনি এক ব্যতিক্রমী চিকিৎসক যিনি অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে থেকেও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৩৩ খ্রিঃ ২ নভেম্বর হাওড়ার পাইকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। উচ্চতর বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই তিনি IMS ও MD ডিগ্রি লাভ করেন। চন্দ্রকুমার দে-র পরে তিনিই হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এমডি। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় মেধাবী ও সৃজনশীল ছাত্র হিসেবে তিনি অধ্যাপকদের প্রিয় হয়ে ওঠেন। একজন সেরা অ্যালোপ্যাথ হিসাবে তিনি চিকিৎসা শুরু করেন এবং ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কলকাতা শাখার একজন সক্রিয় সদস্য হন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব গলরোগে আক্রান্ত হলে ১৮৮৫ খ্রিঃ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শুরু করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন ভক্তমণ্ডলীর কাছে অবতারপুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হিসেবে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৪ খ্রিঃ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মহেন্দ্রলাল সরকার একজন বিজ্ঞানসাধক হিসেবে বঙ্গ তথা ভারতে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যদিও তাঁর অবদান সম্পর্কে যথাযথ চর্চা ও আলোচনায় আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমদিকে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিয়োপাথি চিকিৎসা পদ্ধতিকে 'হাতুড়ে চিকিৎসা' বলে কটাক্ষ করতেন কিন্তু মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ৪র্থ বার্ষিক সভায় সহসভাপতির ভাষণে তিনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতির মূল নীতির অনুকূলে মত প্রকাশ করেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা শুরু হয় এবং ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকেও তিনি বিতাড়িত হন। ১৮৬৮ খ্রিঃ থেকে তিনি নতুন উদ্যমে নিজের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকা 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন' প্রকাশ শুরু করলেন। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয় 'Our Creed'-তে লিখলেন, ''যেমন ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিশ্বাস বর্তমান, চিকিৎসাশাস্ত্রেও সেরকম। কোনো এক ধরনের চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে অজ্ঞতা এই বিভেদকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়।'' হোমিয়োপ্যাথির প্রসার এবং আরও উন্নতিসাধন করাই ছিল তাঁর এই পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য। কারণ তিনি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসার মাধ্যমে জনকল্যাণের বীজ দেখেই তার প্রসারের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। শীঘ্রই তিনি হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসা ব্যবসায়ে এবং চিকিৎসক হিসেবে শীর্ষস্থানে উঠলেন। তৎকালীন কলকাতার প্রখ্যাত হোমিয়োপ্যাথি চিকিৎসক Dr. Berigny কলকাতা ত্যাগের সময় নিজের সঙ্গে উদীয়মান চিকিৎসক মহেন্দ্রলালের তুলনা করে বলেছিলেন 'এখন চাঁদের অস্ত যাবার সময় হয়েছে, কারণ দিকচক্রবালে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। যদিও চিকিৎসা শুরুর প্রথম ছয়মাস তাঁর কোনো রোগী ছিল না, মেটিরিয়া মেডিকা পড়া ছাড়া। তিনি শুধু একজন সাধারণ চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তিনি হ্যানিম্যানের চিকিৎসাপদ্ধতির সত্যতা মেনে নিয়েও নতুনভাবে চিকিৎসাপদ্ধতি এবং নতুন হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ আবিষ্কার করেন। নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতেই তিনি বেশি আগ্রহী ছিলেন। একজন রোগীর একই সঙ্গে হোমিয়োপ্যাথি,অ্যালোপ্যাথি বা অন্য পদ্ধতিতে চিকিৎসা চললেও তিনি আপত্তি করেননি। যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসার সময় কাশীপুরে তাঁকে না জানিয়ে কবিরাজ ও অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারকেও ডাকা হতো, এই বিষয়ে তিনি উদারমনা ছিলেন।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পত্রিকায় তিনি ভারতবাসীর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানচর্চার জন্য জাতীয় সভার আবশ্যকতা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেন এই সভার উদ্দেশ্য হবে দরিদ্রদের অবস্থার উন্নয়ন এবং তাদের জীবনযাত্রা আরও আরামদায়ক করার পথ দেখানো। জনগণকে বিজ্ঞানশিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষার দ্বারা জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা এবং বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট করা। নিজের পত্রিকা ছাড়াও হিন্দু পেট্রিয়ট, বেঙ্গল রেকর্ডার, বঙ্গদর্শন প্রভৃতি প্রতিকার মাধ্যমেও বিজ্ঞানচেতনা প্রসারের জন্য তিনি নিয়মিত লেখনী ধারণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই কাজে মহেন্দ্রলালকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন। ইউরোপীয়রা শুধু বাহুবলে নয়, বিজ্ঞানবলেও ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করেছে। তাই বিদেশি প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্য ভারতবর্ষের মানুষকে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে বিজ্ঞানচেতনার প্রসারে অগ্রসর হতেই হবে—এই ছিল মহেন্দ্রলালের দৃঢ়মত। জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ফাদার লাফোঁ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীমোহন মুখার্জি, জয়কৃষ্ণ মুখার্জি, রমেশচন্দ্র ব্যানার্জি প্রমুখ স্বনামধন্য ব্যক্তির সক্রিয় আর্থিক সাহায্য নিয়ে ১৮৭৬ খ্রিঃ Indian

Association for the cultivation of science-এর পথ চলা শুরু হয়। ডাঃ সরকার ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন সম্পাদক। এই প্রতিষ্ঠানের সভাগুলিতে তিনি নিয়মিত তড়িৎবিজ্ঞান, চুম্বকবিজ্ঞান, তাপবিজ্ঞান এবং আলোকবিজ্ঞান ও ধ্বনিবিজ্ঞানের বিষয়ে বক্তব্য রাখতেন। ১৮৭৮–১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ১৫৪টি বক্তৃতা দিয়েছেন। সেই সব সময় বিভিন্ন কলেজ থেকে ছাত্ররা যেমন আসত তেমনি সাধারণ আগ্রহী মানুষ এবং ইউরোপীয়রাও আসতেন। বিজ্ঞানসভার পাঠ্য বিষয় শীঘ্রই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ চুনীলাল বসুর মতো বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও বিদগ্ধ মানুষ এই বিজ্ঞানসভায় বক্তা হিসেবে আসতেন। ডাঃ রামচন্দ্র দত্ত রসায়নে, প্রমথনাথ বসু খনিজবিদ্যায় এবং গিরিশচন্দ্র বসু উদ্ভিদবিদ্যায় বক্তৃতা দিতেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু Practical Class পরিচালনা করতেন। এই বিজ্ঞানসভায় খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা দিনরাত গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯০০ খ্রিঃ Convocation-এ বড়লাট কার্জন বলেছিলেন, ''Indian Association for the cultivation of Science-এর জন্য ডাঃ সরকার প্রায় ২৫ বছর আত্মনিয়োগ করে আছেন। কিন্তু তাঁর শ্রমের যথার্থ সম্মান করা হয়নি। আমি অনেক সময় আশ্চর্য হই এই ভেবে যে, যেখানে বঙ্গদেশে বিজ্ঞান ও কৃষ্টির পরিপোষকের অভাব নেই, সেখানে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি সাহায্য করা হচ্ছে না কেন?'' বিজ্ঞানসভাকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে মহেন্দ্রলাল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেছিলেন, সেই কারণে খ্যাতিমান চিকিৎসক হিসেবে অর্থ উপার্জনের দিকটা তিনি একেবারেই গুরুত্ব দেননি। তিনি তৎকালীন বঙ্গসমাজের সচেতন ও আর্থিক সমৃদ্ধ মানুষের নিকট থেকে এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন আশা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। তাই ১৯০২ খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসের বিজ্ঞানসভার বার্ষিক অধিবেশনে মহেন্দ্রলাল বলেন, ''আমার জীবন ব্যর্থ হয়েছে বলে আমার ধারণা হয়েছে। আমি সে কার্য সম্পন্ন করতে পারিনি—যার জন্য আমি আপনাদের সহযোগিতা চেয়েছিলাম। যে সহযোগিতা পাওয়া গেছে তার দ্বারা তিনটি অধ্যাপকের মধ্যে একটির যোগ্য তহবিলও সৃষ্টি হয়নি। আমি যদি নিজে চিকিৎসা ব্যবসায়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করতাম, তবে গত ৩০ বছর ধরে যে দান সংগৃহীত হয়েছে, তার চেয়ে বেশি অর্থ অর্জিত হতো কিন্তু তা হলে এই সভা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হতো না।'' এইটিই তাঁর শেষবারের মতো বিজ্ঞানসভায় বক্তৃতা।

বিজ্ঞানসভা মনোমত গড়তে পারেননি বলে মহেন্দ্রলালের মনের মধ্যে সর্বদা ক্ষোভ ছিল। যদিও বঙ্গের তৎকালীন লেফটেনান্ট গভর্নর স্যার জন উডবার্ন এ সম্বন্ধে একটি সভায় বলেছিলেন, ''বিজ্ঞানসভা সম্বন্ধে যে সমস্ত কাজ আপনি করেছেন, তাতে আপনি সন্তুষ্ট নন। এর কারণ এই নয় যে সেগুলি সামান্য কাজ; বরং তার কারণ এই যে, আপনার আদর্শ এত উচ্চ যে আপনি অল্পে সন্তুষ্ট নন। সাধারণের নিকট যা অসামান্য, আপনার নিকট তা সামান্য মাত্র।'' ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যেমন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যাকে নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এই চিকিৎসাবিদ্যার মূলে যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তা তিনি আবিষ্কার করেছেন, পাশাপাশি বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের বৈজ্ঞানিক মনোভাব কোনোদিনই বিসর্জন দেননি।

বিজ্ঞানসভা আরও ভালোভাবে গড়ে উঠেছিল মহেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরবর্তীকালে। ১৯০৭ খ্রিঃ ব্রিটিশ সরকারের অর্থবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী কর্মচারী হিসেবে কলকাতার অফিসে কাজ করার সময় চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরমণ বিজ্ঞানসভার সদস্য হন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে আলোকরশ্মি বিকীরণের উপর নতুন তথ্য (যা Raman effect নামে পরিচিত) আবিষ্কার করে সিভি রমণ নোবেল পুরস্কার পান। তারও অনেক পরে ১৯৫০-৫১ সালে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যমে এই বিজ্ঞানসভা বৌবাজার থেকে যাদবপুরে ২৯ বিঘা জমির উপর নির্মিত ভবনে চলে আসে । মহেন্দ্রলালের বিজ্ঞানসভাকে কেন্দ্র করেই ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণা প্রসারিত হতে থাকে—একথা অনস্বীকার্য।

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জনসেবা ও জাতীয়তাবাদী চরিত্র গঠিত হয় তাঁর কর্মজীবনের শুরু থেকেই। চিকিৎসাবিজ্ঞান তাঁর কাছে ব্যবসা বা অর্থ উপার্জনের একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি। চিকিৎসক হিসেবে তিনি দ্রুত নিজেকে জনসেবার কাজে নিয়োজিত করেন। বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য ভারতসরকার তাঁকে C.I.E. উপাধিতে ভূষিত করে। উল্লেখ্য, বঙ্গের প্রত্যেক গভর্নর তাঁর কাজে মুগ্ধ হন। ১৮৮৭ খ্রিঃ তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য হন এবং কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন। ১৮৮৯ খ্রিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আইনের শ্রেষ্ঠ D.L. উপাধি প্রদান করে। ব্রিটিশ বিজ্ঞান সমিতি এবং ফরাসি জ্যোতির্বিদ্যা সমিতির তিনি ছিলেন আজীবন সদস্য। অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক হিসেবে তিনি বহুদিন বহু সময় শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করেন এবং ঈশ্বর বিশ্বাসের যে প্রস্রবণ তাঁর মধ্যে ছিল ক্ষীণধারায়, তা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে সহস্রধারায় প্রবাহিত হতে শুরু করে। শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখতে এসে একদিন মহেন্দ্রলাল নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে দু-তিন ঘণ্টা ভজন শুনে আপ্লুত হয়ে আনন্দে নরেন্দ্রনাথকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করে বলেছিলেম, ''এর মতো ছেলে ধর্মলাভ করতে এসেছে দেখে আমি আনন্দিত। এ একটি রত্ন, যাতে হাত দেবে তাতেই উন্নতি সাধন করবে।''

ডাঃ মহেন্দ্রলাল দিনের পর দিন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসেছেন কখনো চিকিৎসক হিসেবে, আবার কখনো এমনি ভালবাসার টানে। অনেক সময় শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্য কাজে সময় কম দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের চরিত্রের গুণাবলীর জন্য আধুনিক বিজ্ঞানের উপাসক মহেন্দ্রলাল তাঁকে অসীম শ্রদ্ধার আসনে বসান। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার ফলেই তাঁর ভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে ডাক্তার সরকারের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলাল অনেকগুলি সংগীত রচনা করেন। সেগুলিতে তাঁর আত্মনিবেদন ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে তাঁর শরণাগতি স্পষ্ট হয়।

এইভাবে মহেন্দ্রলাল সরকার ভারতবর্ষে বিজ্ঞানচেতনা প্রসারে এবং চিকিৎসাবিদ্যাকে জনসেবার লক্ষ্যে পরিচালিত করে এক অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর সেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার আদর্শ সম্পর্কে আমাদের গভীর চর্চা ও অনুধ্যান করা দরকার। □

ডঃ মেঘনাদ সাহা এবং 'সবই ব্যাদে আছে' একটি পর্যলোচনা

পিন্টু সান্যাল

ডঃ মেঘনাদ সাহা অতি উচ্চমানের পদার্থবিজ্ঞানী---এই নিয়ে কারও শংসাপত্রের প্রয়োজন নেই। পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আয়োনাইজেশন নিয়ে তার তত্ত্ব পড়েছি এবং নক্ষত্রদের গঠন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তার প্রয়োগের ব্যাপকতা, এই বাঙ্গালি বিজ্ঞানী প্রতিভা চিনিয়েছে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সুখ্যাতি নিয়ে প্রশ্ন করবেন, তিনি অতি সহজেই নিজের মুর্খতার অকাট্য প্রমাণ রাখবেন। 'বেদ' না পড়েই 'সবই ব্যাদে আছে' এই কথাটির পেছনে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ মেঘনাথ সাহা খুঁজে পাননি কিন্তু তিনি এও বলেননি যে বেদে কিছুই নেই। মেঘনাথ সাহা স্বীকার করেছেন যে সংস্কৃত জানেন না বলে মূল বেদ তিনি পড়েননি এবং তার অনুবাদ পড়েছেন। আর প্রথম জীবনে তিনি ঋকবেদকেই সমগ্র বেদ বলে ভুল করেছিলেন, সে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন।

সবই বেদে আছে এই কথাটি যেমন ঠিক নয় তেমনি বেদ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন না করে বিজ্ঞানের একটি শাখায় পারদর্শী কোনো বিজ্ঞানী যদি দাবি করেন বেদে কিছুই নেই তাহলে সেই কথা থেকে তার অজ্ঞানতাই প্রকাশিত হয়।

আধুনিক পৃথিবী অনেক এগিয়েছে। এখন প্রচুর গবেষণা হচ্ছে, সেই গবেষণা সম্পর্কে প্রায় ৬৮ বছর আগে প্রয়াত কোনো বিজ্ঞানীর ধারণা থাকা সম্ভব নয়।

হিন্দু ধর্মের তথা সনাতন শাস্ত্রের মধ্যে থাকা বিজ্ঞানের গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে সন্দিহান ব্যক্তিরা মেঘনাথ সাহার 'সবই ব্যাদে আছে' প্রবন্ধটি উল্লেখ করেন।

কিন্তু ভেবে দেখতে হবে, মেঘনাথ সাহার বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র নিয়ে মন্তব্য ও চিন্তন সেইসময়ের ইতিহাস জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। এখন বিজ্ঞানেরই সহায়তায় ইতিহাসের পুরনো দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে। 'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম' প্রবন্ধে মেঘনাথ সাহা এই মন্তব্যটি করেছেন—''বলাবাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব নিহিত আছে।''

স্বাভাবিকভাবেই মেঘনাথ সাহা অনিশ্চয়তা নীতির জনক হাইজেনবার্গের উপনিষদ সম্পর্কে শ্রদ্ধার খবর রাখতেন না, পরমাণু বোমার ম্যানহাটন প্রজেক্টের কর্ণধার রবার্ট ওপেনহাইমারের ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে শ্রদ্ধার কথা জানতেন না।

এ তো গেল শ্রদ্ধার কথা কিন্তু প্রমাণ? বিগত ৫০ বছরে অনেক কিছু প্রমাণ হয়েছে, যার খবর ডক্টর মেঘনাদ সাহার পাওয়ার কথাই নয়। যেমন গর্ভ উপনিষদে, গর্ভস্থ মানব ভ্রূণের শারীরিক গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা অনেক পরে পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, গর্ভ উপনিষদের অনুবাদ করেছেন এক জার্মান Paul Deussen, 1921 সালে। ভারতীয় শাস্ত্রের বিজ্ঞান নিয়ে প্রমাণ-সহ গত ৫০ বছরে বহু স্বনামধন্য বিজ্ঞানী গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় ডঃ মেঘনাদ সাহার 'তন্ন তন্ন করে খোঁজা'র মধ্যে ফাঁক থেকে গিয়েছিল, নাহলে এই মহান বিজ্ঞানী 'তন্ত্রসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে থাকা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয়ের তত্ত্বগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন। কলনবিদ্যা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। ১৮৩৫ সালে Charles M Whish তাঁর পুস্তকে (Page 512-513) ভারতীয় কলনবিদ্যা নিয়ে যা বলেছেন তা ভারতবর্ষের বিজ্ঞানের ইতিহাস নিয়ে যে কোনো বিজ্ঞানীকে গর্ব করতে বাধ্য করবে। নিউটনের বহু আগেই যে ভারতে অসীম শ্রেণীর যোগফল তথা কলনবিদ্যার জন্ম হয়েছিল তা নির্দ্বিধায় বলেছেন C. M. Whish। ভারতীয় কলনবিদ্যার জন্মের ২৫০ বছর পর ইউরোপে নিউটন ও লেবনিজ আলাদাভাবে ক্যালকুলাসের জন্ম দেন। এখন উইকিপিডিয়ায় খুঁজলে সহজেই পাওয়া যায় গণিতের সাইন, কোসাইন, ট্যান ইনভার্সের সিরিজ সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপে আবিষ্কার করার আগেই পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাধবাচার্য সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। বৌধায়নের শূল্বসূত্রে তথাকথিত পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনেক আগেই ভারতবর্ষে জানা ছিল। বৈদিক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট বর্গাকার, বৃত্তাকার ও অর্ধ বৃত্তাকার যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুতির বিধি শূল্বসূত্রে বলা হয়েছে।

'আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুজাতি' প্রবন্ধে ডঃ মেঘনাদ সাহা অনিলবরণ রায়ের কথার সমালোচনা করে গভীর বিশ্বাসের সঙ্গেই বলেছেন, ''বর্তমান বিজ্ঞানের যে সমুদয় তথ্য, যেমন---

'ক্রমবিবর্তনবাদ', 'জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার' ইত্যাদি প্রাচীন শাস্ত্রে কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে 'অলীক ও ভ্রান্ত' তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি।"—বিজ্ঞানী যা প্রমাণ করেছেন বলে দাবি করেছিলেন তা যে সঠিক নয় তার প্রমাণ বর্তমান গবেষণা দিয়েছে শুধুমাত্র বিশ্বের বিজ্ঞানের ইতিহাসে হিন্দু জাতির অবদান শ্রেণীকক্ষের পাঠ্যপুস্তকে আসার অপেক্ষা। ডঃ মেঘনাদ সাহা প্রাচীন শাস্ত্রে থাকা বিজ্ঞানের দাবিকে 'বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার' বলেছেন।

৫০ বছর আগে ডঃ মেঘনাদ সাহা যে ইতিহাস জানতেন আর এখন ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমাদের সামনে আছে তার মধ্যে পার্থক্য অনেক। একটা উদাহরণ দিই—''সুতরাং আশা করি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খৃঃ পঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে, সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ইজিপ্ট, ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল।" .....বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর এই মন্তব্যটি বিজ্ঞানের আলোকেই এখন ভুল বলে প্রমাণিত হচ্ছে। যে সরস্বতী নদীর উল্লেখ এবং যে অবস্থার উল্লেখ ঋগ্বেদ সংহিতায় পাওয়া যায় তা কম করেও দশ হাজার বছর আগেকার অবস্থা বলে ইসরো, আই আইটি, বার্ক (বি এ আর সি) ইত্যাদি ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান প্রমাণ করেছে। একই প্রবন্ধে ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলেছেন ''এই সমস্ত ঘটনা হইতে বোধ হয় ধরিয়া লওয়া অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোনো নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাহারা বিজেতা হিসাবে যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন।" কিন্তু কমিউনিস্টদের বহুল প্রচারিত 'আর্য আগমন তত্ত্ব' বা 'আর্যরা বহিরাগত'-এর কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আসলে আর্য জাতিবাচক শব্দই নয়, গুণবাচক শব্দ। শিক্ষিত ভারতবর্ষীরা যে সম্পূর্ণভাবে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশে নিজেদের সভ্যতার সূচনা করেছিল তারই প্রমাণ বর্তমান বিজ্ঞান বারেবারে দিচ্ছে। ডঃ মেঘনাদ সাহার সমসাময়িক কালে এই বঙ্গেরই একজন শিক্ষাবিদ ফলিত জ্যোতিষ ও বেদ নিয়ে চর্চা করে বেদকেই ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রথম পুস্তক বলে অভিহিত করেন। ডঃ মেঘনাদ সাহা যে 'বেদ'কে দুর্বোধ্য বলছেন তার বিভিন্ন শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শ্রীমতী বেলাবাসিনী গুহ দেখান যে আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক মৌলিক তত্ত্বই বেদে রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে যিনি সংস্কৃত জানেন এবং ইংরেজিটাও নিজের চেষ্টায় লিখেছিলেন সেই স্বাধীনতা সংগ্রামী ও শিক্ষাবিদের ওপরই বিশ্বাসটা বেশি রাখতে হয় যদি বিজ্ঞান ও যুক্তিবোধকে নিজেদের আত্মীয় বলে ভাবি। বেলাবাসিনী গুহের 'ঋগ্বেদ ও নক্ষত্র' মেঘনাদ সাহার মৃত্যুর ১১ বছর পর প্রকাশিত হয়। এই ১১ বছর সময়ের পার্থক্য না থাকলে বাঙ্গালি 'সবই ব্যাদে আছে'র তির্যক কটূক্তির বদলে 'বেদে অনেক কিছু আছে' পেতে পারতো। বিভিন্ন রূপকের আড়ালে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে বেদে যে ধারণা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বলেছেন শ্রীমতী গুহ।

'সবই ব্যাদে আছে' বললেও ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে ভারতবর্ষে যে 'Calendar Reform Committee' তৈরি হয়েছিল, তার রিপোর্টে ঋকবেদ ও যজুর্বেদে যে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও কালগণনা সংক্রান্ত তথ্য রূপকের আড়ালে আছে তা বের করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতিতে যে বিভিন্ন নক্ষত্রের নাম আসে তা বেদ ও বিভিন্ন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ যেমন শতপথ ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বিভিন্ন শ্লোক উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে উদ্ধৃত করে ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা করেছে ডঃ মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বাধীন কমিটি। সবথেকে বেশি শব্দ খরচ করা হয়েছে ভারতীয় কালগণনা পদ্ধতি নিয়ে আর তার ইতিহাসের জন্য সংস্কৃতে লিখিত শাস্ত্রগুলিকেই ঘাঁটা হয়েছে। কালগণনা ছাড়া বিজ্ঞানের গবেষণা বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞান কল্পনা করাই যায় না। তাই ভারতীয় শাস্ত্রে বিজ্ঞানের কোনো মৌলিক তথ্য নেই—এটা বলা ভুল। বেদে সব না থাকলেও একজন বিজ্ঞানীর অন্বেষণের মতো বিষয়বস্তু যে বেদে আছে তা প্রমাণিত। সেই রিপোর্টে বেদের একটি শ্লোকের মধ্যে নিহিত অর্থ বের করার জন্য বালগঙ্গাধর তিলকের প্রশংসা করা হয়েছে। যে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার আমরা ব্যবহার করি তাকে 'অবৈজ্ঞানিক' বলেছেন ডঃ মেঘনাদ সাহা। ডঃ মেঘনাথ সাহার একটা উক্তিকে সামনে রেখে যারা নিজেদের বিজ্ঞানমনস্কতা প্রমাণ করতে চান, তারা কি অবৈজ্ঞানিক ক্যালেন্ডারকে নিজেদের জীবনের অংশ করেননি?

ইসরোর প্রাক্তন বিজ্ঞানী ডঃ অনিল নারায়ণন তাঁর 'The Siamese Manuscript' বইতে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান কীভাবে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাছে ঋণী। এই বইটি সহজলভ্য না হওয়ায় 'সব বেদে নেই' তত্ত্বের সমর্থকরা এটি পড়ার সুযোগ পান না তবে ডক্টর নারায়ণনের অনেক প্রবন্ধ সহজেই পাওয়া যায়। ডঃ নারায়ণন ওই বইতে বলেছেন কীভাবে খ্রিস্টান মিশনারিদের মাধ্যমে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি ইউরোপে পৌঁছায় আর ইউরোপীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক Cassini, গণিতজ্ঞ Euler ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। ভারতের ত্রিকোণমিতির জ্ঞান ছাড়া বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব ছিল না।

ডঃ মেঘনাথ সাহার শিক্ষক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 'হিন্দু রসায়নী বিদ্যা' বইতে দেখিয়েছেন যে হিন্দুর রসায়ন শাস্ত্রের মধ্যে কী ছিল যা এখনো আমাদের অবাক করে, আর কী ছিল না সে কথাও নির্দ্বিধায় বলেছেন। কোনো কিছুতে 'কী নেই' তা দিয়ে তার বিচার হয় না, বিচার হয় 'কী আছে' তা দিয়ে বা কোনো কিছুতে 'সব নেই' বলেও তাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেওয়া বিজ্ঞানসম্মত বলে দাবি করা যায় না।

ডঃ মেঘনাথ সাহা সমকালীন সময়ে উপলব্ধ তথ্য দিয়ে বেদে ও ভারতীয় শাস্ত্রে কী নেই তা অতি সহজেই বলেছেন কিন্তু তাঁর মতো মহান বিজ্ঞানী যদি সংস্কৃত জেনে বেদে কী আছে বলতেন তাহলে এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহকরা উপকৃত হতেন। যে উপকার পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশীয় বিজ্ঞানীরা করেছেন। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ইংরেজ আমলে যখন ইংরেজি শিক্ষা

ভারতবর্ষে প্রচলনের জন্য ভারতীয়রাই চেষ্টা করছেন তখন কিন্তু প্রচুর ভারতীয় শাস্ত্র যেখানে গণিতের, জ্যোতিষের মূল তত্ত্ব আছে তা বিদেশি 'ভারত তত্ত্ববিদ'রা একের পর এক অনুবাদ করছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী শুধু ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত নয়, বরং ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এই সময় প্রচুর ভারতীয় সংস্কৃতে লেখা বইয়ের অনুবাদ হয়েছে। ভারতবর্ষ থেকে জ্ঞানের এই প্রবাহ কোনোকালেই বন্ধ হয়নি। কোনো সময় বণিকদের দ্বারা, কোনো সময় পণ্ডিতদের দ্বারা ভারতীয় জ্ঞান সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বয়ং মেঘনাদ সাহা গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে মত প্রকাশ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের হিন্দু কালগণনা পদ্ধতি নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন। রাজাবাজার সায়েন্স কলেজের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী 'হিন্দু কালগণনা পদ্ধতি' এই নিয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানের এত বড়ো আবিষ্কার যার জন্য সারা পৃথিবী ভারতবর্ষের নিকট ঋণী, তার উৎস খুঁজে পেতে গেলে বেদের শ্লোকেই ফিরে যেতে হয়। শ্রীমতী গুহ 'ঋকবেদ ও নক্ষত্র সমূহ' বইতে শ্লোক ধরে ধরে এই কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ডঃ মেঘনাদ সাহা বেদের শ্লোকের অর্থ করে সেই শ্লোকে কিছু নেই প্রমাণ করেননি, বরং দুর্বোধ্য বলে তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। ডঃ সাহা নিজের মতামতের জন্য অনুবাদের উপরেই ভরসা রেখেছেন কিন্তু সেকেন্ডারি সোর্সের নিশ্চয়তা নিয়ে 'বিজ্ঞান' প্রতিনিয়ত প্রশ্ন করে। যে কোনো অনুবাদকে প্রশ্নাতীত ধরে নেওয়াকে যুক্তিসম্মত বলা যায় কি?

তিনি বলেছেন, ''মহেঞ্জোদারোর সময় (খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ) এবং অশোকের সময়ের (খ্রিঃ পূঃ ৩০০ অব্দ) মধ্যবর্তী যুগের ইতিহাস লিখিবার উপাদান এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার সমস্ত মূলসূত্র আবিষ্কৃত ও গঠিত হয়।'' কিন্তু লোথাল, কালিবঙ্গান, ঢোলাভিরার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে সন্দেহাতীতভাবে অন্ততপক্ষে ৯ হাজার বছরের প্রাচীন বলে প্রমাণ করেছে। স্বাভাবিকভাবে এই সম্পর্কে ডঃ মেঘনাদ সাহার জানার কথা নয়।

ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কবি, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এমনকী বিজ্ঞানীদের চিন্তা অনেকটা সমকালীন প্রচারিত ইতিহাসের উপর নির্ভর করে। আবার ইতিহাসের জ্ঞান তৎকালীন বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। যেখানে বিজ্ঞান উত্তর দিতে পারে না সেখানে প্রচারিত সমকালীন ইতিহাসকেই বিজ্ঞানীরা প্রাধান্য দেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বিজ্ঞান ইতিহাসের প্রশ্নগুলোর মীমাংসা করতে শুরু করে তখন বিজ্ঞানীদেরও নিজেদের মতামত পরিবর্তন করতেই হয়। এইভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে যায় আর ইতিহাস নিজের ভিতকে মজবুত করে। সনাতন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকভাবে ভিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আরও বেশি মজবুত হচ্ছে এবং অতীতের ভ্রান্তিগুলোও দূর হচ্ছে।

ডঃ মেঘনাদ সাহাকে একজন বেদবিরোধী বিজ্ঞানী হিসেবে উপস্থাপনের অপচেষ্টা রোধ করা প্রয়োজন, কারণ ডঃ মেঘনাদ সাহাকে বেদ, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ-সহ বিভিন্ন ভারতীয় শাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিকতার সমর্থনকারী একজন বিজ্ঞানী হিসেবে প্রমাণ করতে চাইলে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলোকেই তুচ্ছ করা হয় এবং বিজ্ঞানবিরোধী কাজই করা হয়।

আইনস্টাইন যেমন হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিকে বেশি আমল দিতে চাননি। এইরকমই বিজ্ঞানীমহলে তাদের মতামতের বিরোধী বিজ্ঞানীদেরও পাওয়া যায়।

সেই সময়ের ইতিহাসকে সামনে রেখে ডঃ সাহা নিজের মতামত রেখেছেন। বেদ তথা ভারতীয় শাস্ত্রের অবৈজ্ঞানিকতা নিয়ে তিনি যে মতামত রেখেছেন তাতে তাঁকে দোষী করা যায় না। কিন্তু এখনো সেই মতামত ডঃ সাহাকে সামনে রেখে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অবশ্যই দোষের, কারণ তাতে বিগত ৫০ বছরে বিজ্ঞান ভারতীয় শাস্ত্র সম্পর্কে যা যা বলেছে তাকে অবজ্ঞা করা হয়।

বেদে সব নেই কিন্তু বেদে যা আছে তা সেই সময়ে কোথাও ছিল না, আর যা ছিল তা তথাকথিত আধুনিক বিজ্ঞান বলার অনেক আগেই ছিল। বেদে যা বলা হয়েছে তা নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই, আর শুধু বেদ নয়, বিভিন্ন ভারতীয় জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রের অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বই আজ প্রমাণিত আর একইসঙ্গে বিস্ময়ের। 'বেদ' শব্দটি 'বিদ্' ধাতু থেকে এসেছে যার অর্থ 'জ্ঞান', আর যে দেশ সবসময়ই জ্ঞানচর্চায় রত সেই দেশ 'ভারত'। সেই দেশই 'বেদভূমি'। বেদ আর ভারতকে আলাদা করা যায় না। বেদের প্রতি অবজ্ঞা ভরে দিলে ভারতবর্ষকে আপন গৌরবময় ইতিহাস থেকেই দূরে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রসঙ্গত, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার এই সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'তে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি 'ভারতবর্ষ' সম্পর্কে লিখেছিলেন—

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!

ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তি তাঁর সভ্যতার জন্য, তাঁর সংস্কৃতির জন্য আর অবশ্যই তাঁর বিজ্ঞান সাধনার জন্য। পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী' আর পিঙ্গলার 'ছন্দশাস্ত্র' নিজের মধ্যে গণিতের কোন গুঢ়তত্ত্বকে রেখেছে তা 'আধুনিক বিজ্ঞান' জানতে পেরেছে।

একজন বিজ্ঞানীর বিরূপ সমালোচনাকে হাতিয়ার করার আগে বর্তমানের বেদ ও অন্যান্য ভারতীয় শাস্ত্রের মধ্যে থাকা বিজ্ঞানের প্রশংসা করে দেশি-বিদেশি গবেষকদের যে গবেষণাপত্র ও বই বেরিয়েছে তার সমালোচনা করতে পারলে 'বেদে কিস্সু নেই' তত্ত্বের সমর্থকেরা অনেকটা বল পেতে পারেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে ডঃ মেঘনাথ সাহার মতো বিজ্ঞানী ভারতীয় প্রতিভার সে স্বাক্ষর রেখেছেন তা ইতিহাসে অমলিন হয়েই থাকবে আর তার সঙ্গে তিনি স্বজাতির দুঃখে যেভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাকেই বৃহত্তর শিক্ষার লক্ষণ হিসেবেই বাঙ্গালি চিরকাল দেখবে। কিন্তু তার একটি প্রবন্ধকে হাতিয়ার করে সনাতন শাস্ত্রের বৈজ্ঞানিকতা নিয়ে যে কটূক্তি করা হয় তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ এখন বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীরাই দিচ্ছেন। □

আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৫ নভেম্বর আমেরিকায় অনুষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী বছর জানুয়ারিতে যেহেতু তিনি কার্যভার গ্রহণ করবেন, তাই এই মুহূর্তে ট্রাম্প হলেন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট-ইলেক্ট। সবকিছু ঠিক থাকলে ৭৮ বছর বয়সি ট্রাম্প হতে চলেছেন আমেরিকার ৪৭তম রাষ্ট্রপতি। ভোট সমীক্ষা অনুযায়ী রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্প এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের মধ্যে জোরদার লড়াইয়ের ইঙ্গিত থাকলেও বাস্তবে বিপুল জয় পেয়েছেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হতে তাঁর প্রয়োজন ছিল ২৭০টি ইলেক্টোরাল ভোট। ট্রাম্প পেয়েছেন ৩১২টি ইলেক্টোরাল ভোট, হ্যারিস পেয়েছেন ২২৬টি। বর্তমানে ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটদের হোয়াইট ওয়াশ করে সেনেট এবং দ্য হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস্—মার্কিন কংগ্রেসেই উভয় কক্ষেরই দখল নিয়েছেন রিপাবলিকানরা। ইলেক্টোরাল ভোটে জয়ী হওয়ার পাশাপাশি ট্রাম্প পেয়েছেন ৫০.৪ শতাংশ পপুলার ভোট। কমলা হ্যারিস পেয়েছেন পপুলার ভোটের ৪৮ শতাংশ। তাঁকে ব্যাপকভাবে সমর্থনের জন্য আমেরিকান নাগরিকদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন ট্রাম্প। ২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করবেন ট্রাম্প। সেই দিনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য গত ৯ নভেম্বর একটি 'ইনঅগারাল কমিটি' গড়ার কথা ঘোষণা করেন নব-নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট। গত ১১ নভেম্বর তাঁর ক্যাবিনেট ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প।

আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট (উপরাষ্ট্রপতি) হতে চলেছেন জেডি ভান্স। হোয়াইট হাউজ চিফ অফ স্টাফ পদে আসবেন সুজি ওয়াইলিস। তিনি হতে চলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা বা পরামর্শদাতা। ট্রাম্প প্রশাসনে সেক্রেটারি অফ স্টেট হতে চলেছেন মার্কো রুবিয়ো। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হতে চলেছেন মাইকেল ওয়াল্টজ। আমেরিকার উত্তর ও দক্ষিণ সীমান্ত, সমুদ্র ও আকাশসীমার নিরাপত্তার দায়িত্ব পেতে চলেছেন টম হোম্যান। ইউনাইটেড নেশনস্ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘে মার্কিন অ্যাম্বাসাডর হতে চলেছেন এলিস স্তেফানিক। এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সির প্রধান হবেন লী জেলডিন। ডেপুটি চিফ অফ পলিসি হতে চলেছেন স্টিফেন মিলার। ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিবেক রামস্বামী হতে পারেন ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ডিরেক্টর।

ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হলেন সঞ্জীব খান্না

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১১ নভেম্বর ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির (সিজেআই) পদে শপথগ্রহণ করলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করানো-সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিরা-সহ সুপ্রিম কোর্ট এবং বিভিন্ন হাইকোর্টের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারপতিরা। সিজেআই ডিডি ওয়াই. চন্দ্রচূড় অবসরগ্রহণের পর ভারতের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হলেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। ২০২৫-এর মে মাস পর্যন্ত কার্যভার সামলাবেন তিনি। তাঁর পিতা হলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি দেবরাজ খান্না। তাঁর পিতৃব্য হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হংসরাজ খান্না। ১৯৮০ সালে দিল্লি সেন্ট স্টিফেন্স কলেজ হতে স্নাতক উত্তীর্ণ হওয়ার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ ল' হতে আইন সংক্রান্ত ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। তাঁর সহপাঠী ছিলেন ইন্দু মালহোত্রা, যিনি পরবর্তীকালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হন। দিল্লির তিস হাজারি আদালতে একজন আইনজীবী হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন সঞ্জীব খান্না। ২০০৫ সালে দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন সঞ্জীব খান্না। ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে যোগ দেন। বিচারপতি হিসেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রায় তিনি দিয়েছেন। ন্যাশনাল লিগাল সার্ভিসেস অথরিটির (এক্স-অফিসিয়ো) প্যাট্রন-ইন-চিফ এবং ন্যাশনাল ল' স্কুল অফ ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির (ডি-ফ্যাক্টো) চ্যান্সেলর (আচার্য)-এর দায়িত্বও সামলাবেন সিজেআই সঞ্জীব খান্না।

শোক সংবাদ

বাঁকুড়া জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা অখিল ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের পূর্বতন অখিল ভারতীয় সহ-সভাপতি অজিত বারিকের সহধর্মিণী প্রতিমা বারিক গত ১০ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি তাঁর স্বামী ও এক পুত্রকে রেখে গিয়েছেন।

দেশীয় গোরুর প্রজাতিসমূহকে ‘রাজ্যমাতা-গোমাতা’ স্বীকৃতিদান মহারাষ্ট্র সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ৩০ সেপ্টেম্বর, ভারতীয় গোরুর প্রজাতিসমূহকে ‘রাজ্যমাতা-গোমাতা’ বলে ঘোষণা করেছে মহারাষ্ট্র সরকার। গোরু পাচার, গোহত্যার কারণে ক্রমশ কমেই চলেছে দেশীয় গোবংশ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় গো-প্রজাতিগুলির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। দেশীয় গো-প্রজাতিগুলির সংরক্ষণের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিণ্ডে। এর সঙ্গে গোপালনের ক্ষেত্রে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে মহারাষ্ট্র মন্ত্রীসভা। এই প্রকল্পের অধীনে গোশালাগুলির প্রতিটি গোরু পালনের জন্য প্রতিদিন ৫০ টাকা করে অর্থসাহায্য করবে রাজ্য সরকার। মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ বলেছেন যে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে গোশালাগুলির পক্ষে পশুখাদ্য সংগ্রহ করা সহজতর হবে। দেশীয় গো-প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই প্রকল্প সহায়ক হবে।

দেশীয় গো-প্রজাতিগুলিকে ‘রাজ্যমাতা-গোমাতা’-র স্বীকৃতি দান সংবলিত সরকারি সিদ্ধান্তে (গভর্নমেন্ট রেজোলিউশন বা জি.আর-এ) উল্লেখিত হয়েছে যে সুপ্রাচীন কাল হতে মানব জীবনে, সৃষ্টি সংরক্ষণে ভারতীয় গোরু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশীয় গো-প্রজাতিসমূহের ধর্মীয়, বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব নিরূপণ করে বৈদিক যুগ হতে তাদের ‘কামধেনু’ রূপে স্বীকৃতিদান করেছে ভারতীয় সমাজ। মহারাষ্ট্রের মরাঠাওয়াড়া অঞ্চলে দেওনী ও লালকান্ধারী, পশ্চিম মহারাষ্ট্রে খিল্লার, উত্তর মহারাষ্ট্রে ডাঙ্গি; এবং বিদর্ভ অঞ্চলে গৌলৌ-এর মতো বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতি গোরু বিদ্যমান। সম্প্রতি তাদের সংখ্যা প্রতিদিন কমছে বলে জি.আর-এ উল্লেখিত হয়েছে। দেশীয় গোরুর দুধ অধিকতর পুষ্টিগুণসম্পন্ন; এটি একটি সম্পূর্ণ খাদ্য, মানব শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় পুষ্টিকর উপাদান এতে উপস্থিত বলে জানিয়ে জি.আর-এ বলা হয়েছে যে মানুষের খাদ্য ছাড়াও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয় দেশীয় গোরু হতে প্রাপ্ত পাঁচটি পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত পঞ্চগব্য। জৈব কৃষি পদ্ধতিতে ভারতীয় গোরুর গোময় ও গোমূত্রের নানাবিধ প্রয়োগ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায়, দিন দিন দেশীয় গোরুর সংখ্যাহ্রাস উদ্বেগজনক বলে জানানো হয়েছে জি.আর-এ। কৃষকদের গোপালনে উৎসাহদানের লক্ষ্যেই এই প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এবং দেশীয় গোরু বিষয়ক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ভারতীয় গো-প্রজাতিসমূহকে মহারাষ্ট্র সরকার ‘রাজ্যমাতা- গোমাতা’ হিসেবে স্বীকৃতিদান করেছে। মহারাষ্ট্র ক্যাবিনেটের ছাড়পত্র পাওয়া প্রকল্পটির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে গোশালাগুলির আয় খুবই সামান্য। তাদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটির রূপায়ণ করবে ‘মহারাষ্ট্র গোসেবা কমিশন’। প্রকল্পের কাজ অনলাইনে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় থাকবে একটি ‘ডিস্ট্রিক্ট গোশালা ভেরিফিকেশন কমিটি’। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ২০১৯ সালের ২০তম পশু-শুমারি অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির গোরুর মোট সংখ্যা ছিল— ৪৬,১৩,৬৩২ ; যা ছিল ১৯তম পশু-শুমারি অপেক্ষা ২০ শতাংশ কম।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রাক্তন প্রচারক, বিবেকানন্দ শিশুমন্দির, বাঘমুণ্ডির প্রাক্তন আচার্য এবং সরস্বতী শিশুমন্দির বক্সিবাজার (ছোটবাজার), মেদিনীপুরের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাক্তন প্রধানাচার্য, সুগায়ক নিরঞ্জন প্রামাণিক গত ৬ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। তিনি বাল্যাবস্থায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মাদপুর শাখার স্বয়ংসেবক হন। দেশে জরুরি অবস্থার সময় প্রচারক অনন্তলাল সোনীর সহকারী হিসেবে তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। বর্তমানে তিনি হলদিয়াতে থাকতেন এবং সংগীতের শিক্ষকতা করতেন। তিনি তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে রেখে গিয়েছেন।

বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে কালীপূজা প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আদ্যাস্তোত্রে বলা হয়েছে— 'কালিকা বঙ্গদেশে চ...' একটি প্রবাদ রয়েছে যে প্রবাসে পাঁচজন বাঙ্গালি একত্রিত হলেই একটি কালী মন্দির নির্মাণ করেন। বাঙ্গালি ও কালী সমার্থক শব্দ। বঙ্গজীবনে দেবী কালিকার অপরিমেয় প্রভাব অনুভব করেই 'বঙ্গীয় সনাতনী সংস্কৃতি পরিষদ' সম্প্রতি আয়োজন করেছিল কালীপূজা প্রশিক্ষণ বর্গের।

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসাতের অশ্বিনী পল্লীতে গত ২৭ অক্টোবর এক দিবসীয় এই বর্গে মুখ্য আলোচ্য বিষয় ছিল— কালীমূর্তির স্বরূপ এবং তাঁর রহস্য, কালীপূজার ক্রম, উপাচার নিবেদন, পূজার ভূতশুদ্ধি, ন্যাস ও মানসপূজা, বলির স্বরূপ ও তার গুরুত্ব এবং নানাবিধ মন্ত্রের সঠিক ও শুদ্ধ অভ্যাসের আয়োজন হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এই পূজায় আচার অপেক্ষা ভ্রান্তি বেশি। এই ভ্রান্তি দূর করতেই এই বর্গের আয়োজন। কালীমূর্তির রহস্য, দেবী কেন এলোকেশী, দেবীর কণ্ঠে কেন মুণ্ডমালা, শিব কী, শ্মশানই

বা কী, বলি কেন আবশ্যক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচক হিসেবে ছিলেন পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী, পণ্ডিত সৈকত মোহন্ত, ড. রাকেশ দাশ ও রঞ্জন পাঠক। বর্গের মুখ্য ব্যবস্থাপক ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া জেলা থেকে পঞ্চান্ন জন উৎসাহী শিক্ষার্থী বর্গে অংশগ্রহণ করেন। আগামীদিনে এ জাতীয় বর্গ আরও অনুষ্ঠিত হবে বলে সংগঠকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

পাকিস্তান-বাংলাদেশে জেহাদিদের অত্যাচারে নরকে পরিণত সংখ্যালঘুদের জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতের দুই প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা নির্মম নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। এই দুই ইসলামি দেশের মুসলমানদের মধ্যে জেহাদি মানসিকতা এক চরম আকার ধারণ করেছে। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মিরপুরখাস এলাকায় দরিদ্র হিন্দু পরিবারের নাবালিকা কন্যা কেশো বাঈকে যৌন নির্যাতন করে হত্যা করেছে জেহাদিরা। এই ঘটনায় পাকিস্তানের পুলিশকে ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেপ্তারের পরিবর্তে, সিন্ধু পুলিশ নিহত কিশোরীর পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর নথিভুক্ত করে তাদের গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর নির্যাতনের একের পর এক খবর সামনে আসছে। বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় হিন্দুদের নিজের জায়গায় নির্মিত একটি মন্দির সরানোর নির্দেশ দিয়েছে মহম্মদ ইউনুস প্রশাসন। জানা গিয়েছে, গত ২৬ অক্টোবর ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার চরোল ইউনিয়নের দোগাছি- টলিপাড়া গ্রামে স্থানীয় হিন্দুরা তাঁদের জমি পুনরুদ্ধার করে একটি অস্থায়ী শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। দু'দিন পর ২৮ তারিখে সকাল সাড়ে ৮টার সময় স্থানীয় বাসিন্দা আশেশ চন্দ্র মন্দিরে প্রার্থনা করতে গেলে স্থানীয় মুসলমানরা তাঁর উপর অতর্কিতে হামলা চালায়। কয়েকজন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁদের উপরেও হামলা হয়। এই ঘচনার পর থেকেই শিব মন্দিরটি সরানোর জন্য তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস আশ্রিত জেহাদিরা ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ। বাংলাদেশের জেহাদি কার্যকলাপের আরও একটি দৃষ্টান্ত প্রকাশ্যে এসেছে চট্টগ্রাম থেকে। গত ৩০ অক্টোবর চট্টগ্রাম নিউমার্কেট মোড়ে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ছবি দেওয়া গেরুয়া পতাকা টাঙানোর অপরাধে হৃদয় ও রাজেশ নামে দু'জন হিন্দু যুবককে গ্রেপ্তার করেছে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ। হিন্দুদের অভিযোগ, হিন্দুবিরোধী ইউনুস সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকার হরণ করে চলেছে।

পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতেও কিছু অংশে জেহাদি তাণ্ডব দেখা যাচ্ছে। হজরত মহম্মদের ছবি আঁকার অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার শ্যামপুরে একটি দুর্গাপূজা মণ্ডপে আগুন লাগিয়ে দুর্গাপ্রতিমা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় জেহাদিরা। গার্ডেনরিচে দুর্গাপূজায় ঢাক ও মাইক বাজানোর কারণে অষ্টমীর দিন একটি পূজামণ্ডপে হামলা চালায় জেহাদিরা। এরপর জানা যায় যে নবি মুম্বইয়ের তালোজায় একটি হাউজিং সোসাইটিতে দীপাবলির আলো জ্বালানোর বিরোধিতা করে মুসলমানরা। তারা হিন্দু মহিলাদের রীতিমতো গালিগালাজও করেছে বলে অভিযোগ।